আট আনা সংস্করণ গ্রন্থমালার চতুঃষষ্টি গ্রন্থমালা

আত্রেয়ী

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রশশী গুপ্ত বি-এল, প্রণীত

জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৮

প্রকাশক—
শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

* * *

প্রিণ্টার—শ্রীবিহারীলাল নাথ,
এমারেল্ড প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
৯, নন্দকুমার চৌধুরীর ২য় লেন, কলিকাতা।

UTTARPARA JOYKRISHNA PUBLIC LIBRARY
EST 1859

আত্রেয়ী

১

স্ব।

নবীন মজুমদারের বয়স পঁয়তাল্লিশ বৎসর। কলিকাতায় কলেজ ষ্ট্রীটে তাঁহার একটি পুস্তকের দোকান ও ছাপাখানা আছে। সেই ছাপাখানা হইতে "চক্ কথা" নামক একখানি বাংলা কাগজ মুদ্রিত হয়। নবীনই সেই সাপ্তাহিক কাগজখানির সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী। পুস্তকের দোকান সংলগ্ন একটি বৃহৎ কক্ষে নবীন মজুমদার অনেক সময় বসিয়া লেখাপড়া করেন এবং প্রতিদিন সন্ধ্যার পর হইতে সেই কক্ষে তাঁহার বন্ধুদের সমাগম হয় ও রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত মজলিস চলে। সেই মজলিসে গান হয়, কবিতার আবৃত্তি হয় এবং সাহিত্য, রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ের আলোচনা হয়। এই সকল বিষয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে তর্কবিতর্ক করিতে করিতে কখনও কখনও মজলিসের সভ্যগণ অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া পড়েন। তখন নবীন মজুমদার মিষ্ট কথা ও মিষ্টান্ন দ্বারা তাঁহাদিগকে শীতল করেন। নবীন মজুমদার নিজে এই সকল তর্কবিতর্কে বড় একটা যোগ দেন না। তিনি সাংখ্যোক্ত পুরুষের মত উদাসীন ভাবে এই সকল ব্যাপার অবলোকন করেন।

নবীন মজুমদারের মজলিসের সভ্যগণের মধ্যে অল্পদিন হইল কলেজ হইতে বাহির হওয়া যুবকদের সংখ্যাই অধিক। এই সকল যুবকগণের সহিত নবীন মজুমদার অসঙ্কোচে মিশিয়া থাকেন! ইঁহাদের মধ্যে একজন কথাপ্রসঙ্গে মজুমদার মহাশয়কে প্রৌঢ় বলায় তিনি কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন,—

"পেঁচিয়ে কথা ব'ল্লে রূঢ়,
বুঝ্‌তে পারি নৈত মূঢ়;
প্রৌঢ় শব্দে ঠারে ঠোরে,
বুড়া ব'লে চোক্ টেপা!"

সেই অবধি তাঁহার যুবক বন্ধুগণ ভুলিয়াও তাঁহাকে প্রৌঢ় বলেন না।

নবীন মজুমদার অবিবাহিত। তাঁর বাড়ী বাঁকুড়া জেলায়। বাড়ীতে কয়েক বিঘা জমী আছে, তাহাতে যাহা উৎপন্ন হয় তাহা দ্বারা নবীন মজুমদারের এক বিধবা ভগিনী ও তাঁহার একটি অন্ধ পুত্রের সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। মজুমদার মহাশয় প্রতি বৎসর শারদীয়া পূজার সময় পল্লীগ্রামের বাড়ীতে গিয়া প্রায় মাসখানেক সেখানে বাস করেন এবং গ্রামের সকল শ্রেণীর লোকদিগের সহিত অবাধে মিশিয়া তাহাদিগকে গ্রামের উন্নতিকর সকল কার্য্যে উৎসাহিত করেন। ইংরাজী শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকেরা দেশের জনসাধারণের সহিত প্রাণ খুলিয়া মিশেন না বলিয়া আজকালকার ইংরাজী শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকদ্বের একটা বদনাম আছে। ইহা যে নিতান্ত ভিত্তিহীন তাহা বলা যায় না।

নবীন মজুমদার মহাশয়ের চেষ্টায় তাঁহার স্বগ্রাম হরিনগর ও হরিনগরের নিকটবর্ত্তী আরও কয়েকটি গ্রামের ইংরেজী শিক্ষিত লোকদের সহিত সেই সকল গ্রামের জনসাধারণের মনের অমিল ঘটিতে পায় নাই। তাঁহারা ইংরেজী শিক্ষিতদিগকে তাহাদের সুখদুঃখের ভাগী বলিয়া ভাবিতে দ্বিধা বোধ করে না, এবং সেই সকল গ্রামের ইংরেজী শিক্ষিত লোকেরাও গ্রামের চাষাদের সহিত মিশিয়া বা তাহাদের সহিত দুটা কথা বলিয়া তাহাদিগকে কৃতার্থ করিলেন এরূপ বোধ করেন না।

নবীন মজুমদারের চেষ্টায় হরিনগর গ্রামে একটি ইংরেজী বিদ্যালয়, একটি সংস্কৃত চতুষ্পাঠী ও একটি আয়ুর্ব্বেদ-সম্মত চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং সেগুলি বেশ ভাল রকমই চলিতেছে। কেহ কেহ কবিরাজী চিকিৎসালয়ের পরিবর্ত্তে হরিনগরে একটি এলোপ্যাথী ডিস্পেনসারী স্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু নবীন মজুমদারের আপত্তিতে তাহা হইতে পায় নাই।

২

নবীন মজুমদার গ্রামের মাইনর স্কুল হইতে মাইনর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মাসিক পাঁচ টাকা বৃত্তি পান এবং তের বৎসর বয়সে কলিকাতায় গিয়া তাঁহার এক মামার বাড়ীতে থাকিয়া ডফ্ কলেজিয়েট স্কুলে ভর্ত্তি হন। কলিকাতা আসিবার দুই বৎসর পূর্ব্বে নবীনের উপনয়ন সংস্কার হইয়াছিল এবং তিনি যথাবিধি

ত্রিসন্ধ্যা না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না। কলিকাতায় পড়িতে আসিবার পর এক বৎসর পর্য্যন্ত এই নিয়ম যথাযথ প্রতিপালিত হইয়াছিল, কিন্তু খৃষ্টান পাদ্রীদের স্কুলে পড়ার জন্যই হউক, বা সময়ের দোষেই হউক, বা কলিকাতার জল হাওয়ার দোষেই হউক ক্রমশঃ প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মে নবীন মজুমদারের অনাস্থা জন্মিল। তিনি সন্ধ্যা আহ্নিক ত্যাগ করিলেন। এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি পনের টাকা বৃত্তি পাইলেন এবং ব্রাহ্ম-পরিচালিত সিটি কলেজে ভর্ত্তি হইলেন। ফলে হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের প্রতি তাঁহার যেটুকু আস্থা ছিল তাহারও অভাব ঘটিল। তিনি স্থির করিলেন বৈষম্যের চিহ্নস্বরূপ যে উপবীত তাহা আর রাখিবেন না। প্রকাশ্যভাবেই ব্রাহ্ম হইবেন এবং ব্রাহ্মসমাজে নাম লিখাইবেন। তাঁর মাতা এই সংবাদ পাইয়া হরিনগর হইতে কলিকাতায় আসিয়া নবীনকে অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু নবীনের মতের পরিবর্ত্তন হইল বলিয়া মনে হইল না। নিরুপায় হইয়া নবীনের মাতা নবীনকে এই প্রতিজ্ঞা করাইলেন যে, সে যেন আর তিন বৎসর পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে, এই তিন বৎসরের মধ্যে সে যেন ব্রাহ্মসমাজভুক্ত না হয়, উপবীত ত্যাগ না করে এবং এই সময়ের মধ্যে অবকাশমত হিন্দুশাস্ত্রের আলোচনা করে। নবীন মাতার নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। নবীনের সত্যবাদিতায় মাতার বিশ্বাস ছিল। তিনি অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়া বাড়ী গেলেন। নবীনের আর উপবীত ত্যাগ করা হইল না, ব্রাহ্মসমাজে নাম লেখানও হইল না। ইহাতে নবীনের ব্রাহ্ম-

বন্ধুগণ নবীনের উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে "ভীরু", "কাপুরুষ", "কুসংস্কারাচ্ছন্ন" প্রভৃতি বিশেষণে অভিহিত করিতে লাগিলেন এবং কেহ কেহ তাঁহার সহিত বাক্যালাপ বন্ধ করিলেন।

এই সময় বি, এ পরীক্ষার ফল বাহির হইল, নবীন প্রথম স্থান অধিকার করিলেন। বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য বৃত্তি দিয়া গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ইংলণ্ডে পাঠাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন এবং বাংলা গভর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী নবীনকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। নবীনের দুর্ব্বুদ্ধি, তিনি ধুতি চাদর পরিয়া সেক্রেটারী সাহেবের সহিত দেখা করিতে গেলেন এবং তাঁহার সম্মুখীন হইয়া আভূমি শির প্রণত না করিয়া মস্তক যৎসামান্য নত করিয়া সেক্রেটারী সাহেবকে অভিবাদন করিলেন। ইহাতে সাহেব নবীনের উপর হাড়ে হাড়ে চটিয়া গিয়া অসভ্যের ন্যায় ধুতি চাদর পরিয়া সাহেবের সহিত দেখা করিতে যাওয়া অপরাধে নবীনকে যথোচিত তিরস্কার করিয়া তাঁহাকে বসিতে না বলিয়া, তাঁহার সহিত কোনও কথা না কহিয়া, তাঁহাকে একপ্রকার তাড়াইয়াই দিলেন।

নবীনচন্দ্র ইহাতে আপনাকে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করিয়া সংবাদপত্রে সেই ব্যাপারের বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত করিলেন। ইহা লইয়া কয়েক মাস বেশ হৈ চৈ হইল। কেহ বা সেক্রেটারী সাহেবের, কেহ বা নবীন মজুমদারের নিন্দা করিলেন।

নবীন প্রতিজ্ঞা করিলেন যে তিনি গভর্ণমেণ্ট বৃত্তি লইয়া বিলাত যাইবেন না, কোন চাকরীও করিবেন না। খবরের কাগজ

চালাইয়া, পুস্তকের দোকান করিয়া অথবা অন্য কোন ব্যবসা করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিবেন। সেই অবধি নবীন মজুমদার পুস্তকের দোকান, ছাপাখানা ও খবরের কাগজ চালাইতেছেন এবং বৈধ রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিতেছেন।

এই সময়েই হিন্দুশাস্ত্র আলোচনার ফলে হিন্দুধর্ম্মের প্রতি তাঁহার বিরাগের এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি তাঁহার অনুরাগের অভাব ঘটে। তিনি এক সন্ন্যাসীর নিকট দীক্ষিত হন। দীক্ষিত হইবার পর মজুমদার মহাশয়ের আচার ব্যবহারের এইমাত্র পরিবর্ত্তন হইয়াছে যে, তিনি আহারাদি সম্বন্ধে পূর্ব্ববৎ উদারমতাবলম্বী রহিয়াছেন অর্থাৎ মনুনিষিদ্ধ দ্রব্য আহার না করিলেও ব্রাহ্মণেতর জাতির পাক করা খাদ্য আহার করিতে তাঁহার আপত্তি নাই এবং তিনি প্রতিদিন প্রাতঃকালে অন্য কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে দশবার গায়ত্রী জপ করেন ও এক অধ্যায় গীতা পাঠ করিয়া থাকেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে নবীন মজুমদার অবিবাহিত। সে সম্বন্ধে একটুখানি কাব্য আছে।

নবীন যখন ব্রাহ্মমতে ভরপুর, সেই সময় ব্রাহ্মভাবাপন্ন অধ্যাপক চন্দ্রকুমার রায়ের বিদুষী কন্যা রেবার সহিত নবীন মজুমদারের পরিচয় হয়। অনেকেই সেই সময় ভাবিয়াছিলেন যে, রেবার সহিত নবীনের বিবাহ হইবে, কেন না তাঁহাদের পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইয়া অবশেষে উভয়ের মধ্যে অনুরাগের সঞ্চার হয়। একদিবস প্রাতঃকালে অধ্যাপক চন্দ্রকুমার ভ্রমণ করিতে বাহির হইয়া আর ফিরিয়া আইসেন নাই। তারপর কয়েক বৎসর অতীত হইয়াছে,

কিন্তু চন্দ্রকুমারবাবুর উদ্দেশ পাওয়া যায় নাই। চন্দ্রকুমারবাবু নিরুদ্দেশ হইবার পরই তাঁহার ভ্রাতা পণ্ডিত তারাকুমার স্মৃতিরত্ন চন্দ্রকুমারের পত্নী ও কন্যা রেবাকে কাশীধামে লইয়া গিয়া তাঁহাদিগকে খাঁটি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতী চালে চলিতে বাধ্য করেন, সেই অবধি রেবার কোনও সংবাদ জানিতে না পারিয়া নবীন বিবাহ করেন নাই। নবীনের মাতা এজন্য নবীনকে অনুরোধ করিলে নবীন মাতার নিকট হাতজোড় করিয়া এ সম্বন্ধে মাতার আজ্ঞা পালন করিতে পারিবেন না বলিয়া মাতার ক্ষমা ভিক্ষা করিতেন। মাতা প্রথম প্রথম কিছুদিন ছেলেকে বিবাহ করিতে অনুরোধ করিয়া অবশেষে হাল ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। মাতার মৃত্যুর পর নবীনকে বিবাহ করিবার জন্য আর কেহ বড় একটা অনুরোধ করিত না।

৩

তেরশত সতের বঙ্গাব্দের তেরই ফাল্গুন। আজ নবীন মজুমদারের মহাস্ফূর্তি। এই স্ফূর্তির কারণ নবীন মজুমদারের মজলিসের অন্যতম সভ্য বিপিনবিহারীর জন্য বিপিনবিহারীর কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধুকে সঙ্গে করিয়া পাত্রী দেখিতে ভবানীপুর যাইবার জন্য নবীন মজুমদার অনুরুদ্ধ হইয়াছেন। বিপিনবিহারীর পিতা অমরবাবু তখন বাঁকুড়ার সব্‌জজ।

বিপিনের বন্ধুরা মজুমদার মহাশয়ের মজলিস-গৃহে বসিয়া তাঁহাকে তাহাদের সঙ্গে বিপিনবিহারীর বাড়ী শ্যামপুকুরে

যাইবার জন্য তাগাদা করিতেছে। নবীন মজুমদার যুবকদের তাড়া সহিতে না পারিয়া হাতের কাজ ফেলিয়া উঠিয়া পড়িলেন এবং ট্রামে আরোহণ করিয়া মিনিট দশের মধ্যে বিপিনের নিকট উপস্থিত হইলেন। তখন বেলা একটা।

বিপিনের বন্ধুগণ বিপিনকে তাঁহাদের সঙ্গে ভবানীপুরে গিয়া পাত্রী দেখিয়া আসিতে অনুরোধ করিলেন। বিপিন বলিলেন, "আমি প্রাণ গেলেও তাহা করিব না। ইহাতে যদি আমার বিবাহ না হয় তাহাও স্বীকার।" বিপিন যখন কিছুতেই পাত্রী দেখিতে যাইতে সম্মত হইলেন না তখন বিপিনের বন্ধুবর্গ বিপিনকে জানাইলেন যে, "আমরা তোমার পিতার অনুরোধে পাত্রী দেখিতে যাইতেছি। তোমার পিতার বিশ্বাস আমরা পাত্রী দেখিয়া মনোনীত করিলে তোমার আপত্তি থাকিবে না। অন্যান্য বিষয় তোমার পিতা পাত্রীর পিতার সহিত সুস্থির করিয়াছেন। আমরা পাত্রী দেখিতে চলিলাম। তোমার মেজ ভাইও আমাদের সঙ্গে যাইবেন। আমরা কন্যা দেখিয়া আসিয়া তোমাকে কন্যার রূপগুণের কথা যথাযথ বলিব। তারপর তোমার যা মত হয় জানাইও।" বিপিন ইহার কোন উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

নবীন মজুমদারের সমভিব্যাহারে বিপিনের বন্ধুবর্গ একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর ঘোড়ার গাড়ীতে চড়িয়া ভবানীপুরের প্রসিদ্ধ এটর্ণী অজয়বাবুর বাটী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। অজয়বাবুর কন্যা সরলা পাত্রী।

৪

পাত্রী দেখিবার কয়েক দিবস পরে শুভলগ্নে বিপিনের সহিত সরলার বিবাহ হইল। বিবাহান্তে বর বিপিন সুসজ্জিত বাসর-গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল সেই গৃহ বৈদ্যুতিক আলোকে উদ্ভাসিত, সুন্দরীগণের রূপের ছটা যেন সেই বিদ্যুতের আলোককেও নিষ্প্রভ করিয়া দিতেছে। সুন্দরীদের মধ্যে পনের বৎসরের তরুণী হইতে চল্লিশ বৎসরের প্রৌঢ়া আছেন; এই সকল বাসর-রঙ্গিণীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন নামজাদা ডাক্তার হরেন্দ্রনারায়ণ ঘোষালের দ্বিতীয় পক্ষের পত্নী ইন্দ্রলেখা। ইন্দ্রলেখার বয়ঃক্রম ত্রিশ বৎসর। সুন্দরী বলিয়া ইঁহার খ্যাতি আছে। ইনি যেমন সুন্দরী, তেমনি বিদুষী, তেমনি রসিকা, আবার তেমনি গৃহকর্ম্মনিপুণা। ডাক্তার হরেন্দ্রনারায়ণ বিলাত না গিয়াও পুরাদস্তুর সাহেব, তাঁহার পত্নী সাহেবীয়ানা ও দেশী ভাব এক সঙ্গে বজায় রাখিয়াছেন এবং পত্নীর নির্ব্বন্ধাতিশয্যেই ডাক্তার মহাশয় ম্যালেরিয়া, মশা, এঁদোপুকুরপূর্ণ পল্লীগ্রামের সহিত সম্বন্ধ একবারে কাটাইতে পারেন নাই। পল্লীগ্রামের বাটীখানিকে বাসোপযোগী করিয়া রাখিয়াছেন। বৎসরে অন্ততঃ দুই মাস কাল ইন্দ্রলেখা ঠাকুরাণী সন্তানাদি সহ সেস্থানে বাস করেন। দায়ে পড়িয়া ডাক্তার হরেন্দ্রনারায়ণকেও সেই সময়ে মধ্যে মধ্যে পল্লীনিকেতনে যাইতে হয়। ডাক্তার হরেন্দ্রনারায়ণের পৈতৃক নিবাস নদীয়া জেলার মেহেরপুর সবডিভিজনের অন্তর্গত

মশা গ্রামে। পল্লীগ্রামে অবস্থান কালে ইন্দ্রলেখা লজ্জাবতী লতা, কিন্তু কলিকাতায় তাঁর অন্য মূর্ত্তি। মহিলা-সম্মিলনে তাসে খাঁটি অন্তঃপুরিকাদেরই হউক বা ইংরাজি শিক্ষাপ্রাপ্ত স্বাধীনতা-প্রয়াসিনীদেরই হউক, ইন্দ্রলেখার সমান খাতির। ইন্দ্রলেখা যেমন পরিহাস-রসিকা তেমনই সুগায়িকা।

অজয়বাবুর বাটীর অতি নিকটেই ডাক্তার হরেন্দ্রের বাসাবাটী। ইন্দ্রলেখা প্রায়ই অজয়বাবুর স্ত্রী ও কন্যাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অজয়বাবুর বাড়ীতে যাইতেন। অজয়বাবুর এক জ্ঞাতি খুড়ার নাম হরেন্দ্রনাথ। সেই সুবাদে অজয়বাবুর পত্নী ইন্দ্রলেখাকে খুড়ী বলিতেন এবং অজয়বাবুর কন্যারা তাঁকে ঠান্‌দিদি বলিত।

নাত্‌নী সরলার বিবাহ-বাসরে ইন্দ্রলেখার পোয়া বারো, তিনি আসর জাঁকাইয়া বসিয়াছেন। বর বিপিন বাসরঘরে প্রবেশ করিবামাত্র দুই হাত তুলিয়া ঠান্‌দিদি ইন্দ্রলেখাকে সেলাম করিতে আদেশ করিল। বিপিন ইন্দ্রলেখা ঠাকুরাণীর কথা ইতিপূর্ব্বে কিছু শুনিয়াছিল। সেজন্য ইন্দ্রলেখা ঠাকুরাণীর আদেশ একান্ত বশংবদ ভৃত্যের মত পালন করিয়া যোড়হস্তে দ্বিতীয় আদেশের প্রত্যাশায় দাঁড়াইয়া রহিল। ইন্দ্রলেখা বরকে ক'নের পাশে বসিতে আদেশ করিলেন। বিপিন তাহাই করিল। এমন সময়ে বিপিনের শাশুড়ী আসিয়া ইন্দ্রলেখা ঠাকুরাণীর নিকট গিয়া বলিলেন, "তোমার নাতজামাইকে বেশী রাত জাগিও না বাছা। তা হ'লে অসুখ করবে।" ইন্দ্রলেখা বলিলেন, "সেজন্য তোমার

কোন চিন্তা নাই মা। এই এখন রাত্রি সাড়ে বারটা। রাত্রি দুইটার সময় আমরা তোমার জামাইকে নিষ্কৃতি দিব। রাত দু'টা পর্য্যন্ত জাগিয়া পরীক্ষার পড়া মুখস্থ করার অভ্যাস তোমার জামাইএর আছে। তুমি বাছা এখন অন্য কাজ করগে।" বিপিনের শাশুড়ী বেগতিক দেখিয়া সরিয়া পড়িলেন। তখন ইন্দ্রলেখা ঠাকুরাণী বিপিনকে প্রশ্ন করিলেন, "বর, আমরা শুনিয়াছি যে তুমি বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দুই বিষয়ের অনার্সে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছ ?"

বিপিন। আজ্ঞা হাঁ, সে কথা সত্য।

ইন্দ্রলেখা। শুনিয়াছি তুমি সঙ্গীতবিদ্যাবিশারদ ?

বিপিন নিরুত্তর রহিল। ইন্দ্রলেখা বলিলেন, "এখানে চুপ করিয়া থাকিলে চলিবে না, আমাদের সময়ের মূল্য আছে। আমার কথার উত্তর দাও। বল হাঁ কি না।"

বিপিন হাসিয়া বলিল, "আপনি যে ব্যারিষ্টারের মত জেরা সুরু করিলেন। ঠাকুর্দ্দা ম'শায় তো নাড়ী টিপিয়া বেড়ান।"

ইন্দ্রলেখা। চালাকি করিয়া আসল কথা চাপা দিলে চলিবে না। আমার প্রশ্নের উত্তর দাও।

বিপিন। আপনার প্রশ্ন আর একবার বলুন।

ইন্দ্রলেখা। সোজা বাঙ্গালা কথায় বলিতেছি। তুমি গান বাজনায় পটু কিনা ?

বিপিন। যৎসামান্য গান বাজনা জানা আছে। তবে গান শুনিতে খুব ভালবাসি।

ইন্দ্রলেখা। (সরলার গা ঈষৎ ঠেলিয়া) নাতনি! নাতজামাই কাটখোট্টা নয়। আচ্ছা নাতজামাই তোমার সঙ্গীত-বিদ্যার পরিচয় আমাদের একটু দাও।

বিপিন। আমি শুনিয়াছি রীতিমত ওস্তাদ রাখিয়া আপনার পিতা আপনাকে গান শিখাইয়াছেন। এখনও আপনি গীতবাদ্যের চর্চ্চা করেন। আমি আপন মনে টেবিল ও বই বাজাইয়া গান করি। আপনার কাছে আমার গলা দিয়া সুর বাহির হইবে না।

ইন্দ্রলেখা। আর অত বিনয়ে কাজ নাই। একটি গান গাও, নহিলে কিছুতেই ছাড়িব না। গান না গাহিলে তোমার শ্যালিকা-সম্প্রদায় তোমার কান দুটি আস্ত রাখিবে না।

বিপিন। কবি তো বলিয়াছেনই—

"শ্যালী ভিন্ন
অন্যে কার নয় তা আদর চিহ্ন।"

ইন্দ্রলেখা। ভাই তরলা, তোর ভগিনীপতিকে একটু ভাল ক'রে আদর করিয়া আয় তো।

অমনি তরলা বিপিনের দক্ষিণ কর্ণ ধারণ করিবার জন্য হাত বাড়াইল। বিপিন একটু ঘাড় সরাইয়া বলিল, "ইহাতেই যথেষ্ট আপ্যায়িত হইয়াছি। এখন কি করিতে হইবে বলুন।"

ইন্দ্রলেখা। ক'বার বলিব। গান গাও।

বিপিন। না গাহিলে কিছুতেই অব্যাহতি দিবেন না?

ইন্দ্রলেখা। না।

বিপিন। তাহা হইলে এ অধীনের একটি আরজি আছে।

ইন্দ্রলেখা। পেশ কর।

বিপিন। আপনি যদি দয়া করিয়া প্রথমে কয়েকটি গান করেন, তাহা হইলে আমি শেষে চেষ্টা করিতে পারি। আর একটা কথা আছে—এখানে গান করিলে শ্বশুর, শাশুড়ী বা বড় সম্বন্ধীদের মধ্যে কেহ বিরক্ত হইবেন না তো?

ইন্দ্রলেখা। তোমার সে ভাবনা নেই। তুমি গাও।

বিপিন। আগে আপনাকে গাহিতে হইবে, তার পর আমি একটি গাইব।

ইন্দ্রলেখা। একটি গাইলে চলিবে না।

বিপিন। আমার একটা গান শোনার পরও যদি এস্থান ত্যাগ না করেন, তাহা হইলে আপনাদের সহ্যগুণের তারিফ করিব এবং যতগুলি গান গাহিতে বলিবেন গাহিব। এখন আপনি একটি গান করুন।

তখন ইন্দ্রলেখা ঠাকুরাণী তরলাকে হার্ম্মোনিয়ম আনিবার আদেশ করিলেন। হার্ম্মোনিয়ম আনীত হইলে নিজেই হার্ম্মোনিয়ম বাজাইয়া গাহিলেন ;—

"মধুর মিলন।
হাসিতে মিশেছে হাসি নয়নে নয়ন॥" ইত্যাদি

গান শুনিয়া অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়া বিপিন গায়িকাকে আর একটি গান গাহিতে অনুরোধ করিল। এমন সময় এক অবগুণ্ঠনবতী যুবতী ইন্দ্রলেখার কানে কানে কি বলিল। ইন্দ্রলেখা একটু হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, এবার তোর ফরমায়েসী

গান গাহিতেছি। এ গানটি হইলে কিন্তু তোমাকে গাহিতে হইবে নাত্‌জামাই।"

বিপিন বলিল, "হুজুরে হাজির আছি। যা দণ্ড করিবেন মাথা পাতিয়া লইব।"

ইন্দ্রলেখা গান ধরিলেন,—

"বঁধু তোমায় ক'রব রাজা তরুতলে।" ইত্যাদি

গান থামিল। এইবার বিপিনের গাহিবার পালা। বিপিন হাত-জোড় করিয়া বলিল, "আজ আমাকে নিষ্কৃতি দিলে ভাল হয়। ঠান্‌দিদির গানের পর আমার গান মোটেই জমিবে না।" বিপিনের এ আপত্তি টিকিল না। সে দেখিল, সে না গাহিলে তাকে কর্ণযুগলের মায়া ত্যাগ করিতে হইবে। তখন আর কি করে, নিতান্ত নিরুপায় হইয়াই যেন গাহিতে সম্মত হইল এবং সুর দিবার জন্য বেহালা চাহিল। ইন্দ্রলেখা বলিলেন, "বেহালার দরকার কি? হার্ম্মোনিয়মে সুর দিয়া গাও না?" জ্যোতির্ম্ময়ী বলিলেন, "আমাদের দেওয়া বেহালাতে হবে, না নীলকমলের মত নিজের বেহালা না হইলে চলিবে না।"

বিপিন হাসিয়া কহিল, "বলিয়াছেন বড় মন্দ নয়। নিজে বেহালা না বাজাইলে আমি গাহিতে পারি না।"

তখন বেহালা আসিল। বেহালার কান মোচড়াইয়া সুর বাঁধিয়া বিপিন গান ধরিল—

"মম যৌবন নিকুঞ্জে গাহে পাখী
সখি জাগো, জাগো।" ইত্যাদি

বিপিনের গান শুনিয়া প্রীত হইয়া ইন্দ্রলেখা ঠাকুরাণী বলিলেন, “ভাই নাত্‌জামাই, তুমি যে কেবল পরীক্ষার পড়া মুখস্থ করিয়াছ, তা নয়। সঙ্গীতেও তোমার অসাধারণ অধিকার। টেবিল চাপড়াইয়া বই বাজাইয়া যারা গান করে তাদের এমন করতপ দেখাইবার সাধ্য নাই। এ মৌখিক প্রশংসা নয়। আর একটি গান হউক।”

বিপিন বলিল, “আপনি আর একটি গা’ন।”

ইন্দ্রলেখা ঠাকুরাণী অমনি গান ধরিলেন—

“তুমি সুন্দর হৃদিরঞ্জন তুমি নন্দন ফুলহার”

ইত্যাদি।

এই গানটি শেষ হইলে বিপিনের বড় শ্যালকের পত্নী যমুনা ইন্দ্রলেখা ঠাকুরাণীকে বলিল, “ঠান্‌দিদি, বাসরঘর তোমরা ধর্ম্মসভা করিয়া তুলিলে দেখিতেছি, ঠাকুরজামাইকে দ্বিজু রায়ের দু’একটা হাসির গান গাহিতে বল।”

ইন্দ্রলেখা বলিলেন, “কেন ভাই, তুমি নিজেই ফরমায়েস কর না কেন? তোমার ঠাকুরজামাই তো হাজির রহিয়াছেন।”

যমুনা তখন ইন্দ্রলেখা ঠাকুরাণীর পশ্চাতে গিয়া বলিলেন, “ঠাকুরজামাই, দ্বিজু রায়ের সেই অর্থাতের গানটা গাও। ও গানটা শুন্‌তে সরলা ঠাকুরঝি খুব ভালবাসে।”

ইন্দ্রলেখা বলিলেন, “অর্থাতের গান আবার কোন্‌টা হইল?”

যমুনা। “কেন জানেন না, সেই যে যার প্রথম ছত্র

‘ওই বিক্রমাদিত্য রাজার ছিল নবরত্ন ন ভাই’;”

সরলা তাহা শুনিয়া কিছুতেই হাস্য সংবরণ করিতে পারিল না। মুখে আঁচল দিয়া বালিশে মুখ গুঁজিয়া শুইয়া পড়িল। ইন্দ্রলেখা ঠাকুরাণী বিপিনকে অর্থাতের গান গাহিতে আদেশ করিলেন।

বিপিন অনেক আপত্তি করিয়া অবশেষে গান ধরিল,—

“ওই বিক্রমাদিত্য রাজার ছিল নবরত্ন ন ভাই ;
আর তানসেন ছিলেন মহা ওস্তাদ এলেন তাঁর সভায়।”

ইত্যাদি।

বিপিন এই গানটি এমন অঙ্গভঙ্গি সহকারে গাহিল যে, শ্রোত্রীবর্গ হাসিয়া লুটাইতে লাগিলেন। এমন সময় গদার মা নাম্নী ঝি আসিয়া ইন্দ্রলেখাকে বলিল, “মা ঠাকরুণ ব’লে পাঠালেন যে, রাত্রি অনেক হ’য়েছে, এইবার আপনারা জামাইকে ঘুমুতে দিন।” ইন্দ্রলেখা গদার মাকে বলিলেন, “তুই গিন্নীকে বল গিয়া আর আধ ঘণ্টার মধ্যে আমাদের মজলিস ভাঙ্গিবে।”

বিপিনও সেই সময়ে জানাইলেন যে, তার ভয়ানক ঘুম পাইতেছে ও সে সেদিনের মত মুক্তি চাহে।

ইন্দ্রলেখা বলিলেন, “এতক্ষণ তো কেবল এ কালের কবিদের গান গাওয়া হইল। তাতে কথার বাঁধুনি যথেষ্ট আছে, কিন্তু আন্তরিকতা কম বলিয়া মনে হয়। আমাদের পূর্ব্ব আমলের সাধক সঙ্গীত একটা গাও দেখি? কমলাকান্ত, কি অকিঞ্চন, কি রামপ্রসাদ, কি রামকৃষ্ণ ইঁহাদের কারও একটা গান গাও। তাহা হইলেই আজিকার মত তোমাকে মুক্তি দিব।”

বিপিন মিনিট দুই চুপ করিয়া কি ভাবিয়া গাহিল—

"ভবে সেই যে পরমানন্দ,
যেজন পরমানন্দময়ীরে জানে।" ইত্যাদি

এই গানটি শেষ হইলে ইন্দ্রলেখা ঠাকুরাণী বলিলেন, "ভাই, তোমার এ গানটি শুনিয়া বাস্তবিকই পরমানন্দ লাভ করিলাম। আশীর্ব্বাদ করি, তোমরা দু'জন চিরসুখে থাক। সরলার আমাদের হাতের নোয়া অক্ষয় হউক, পাকা চুলে সিঁদুর পরুক। এখন তুমি নিশ্চিন্ত মনে তোমার আপনার জনকে লইয়া বিশ্রাম কর। সকাল সাতটার আগে আর কেহ এদিকে আসিবে না। এখন আমরা আসি।" এই বলিয়া ইন্দ্রলেখা ঠাকুরাণী দলবলসহ চলিয়া গেলেন। বিপিন দেখিল, সরলা তৎপূর্ব্বেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তাঁর নিজের শরীরও এলাইয়া পড়িতেছিল, সুতরাং সে শুইবামাত্র গভীর নিদ্রায় মগ্ন হইল।

৫

তৎপর দিবস বেলা দেড় প্রহরের মধ্যেই অমরবাবু কন্যা বিদায় করিয়া লইয়া বর ও বরযাত্রীদের সহিত তাঁর শ্যামপুকুরের বাটীতে ফিরিয়া গেলেন।

সেই দিবস সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে নবীন মজুমদার তাঁর পুস্তকের দোকানে যাইবামাত্র তাঁর ম্যানেজার জানাইলেন যে "একজন সাহেবী পোষাক-পরা বাঙ্গালী তাঁর সঙ্গে দেখা করিবার জন্য এক ঘণ্টা ধরিয়া অপেক্ষা করিতেছেন। তাঁর সঙ্গে অধ্যাপক

সন্তোষবাবু রহিয়াছেন। তাঁহাদিগকে মজলিস-ঘরে বসিতে দেওয়া হইয়াছে।"

নবীন মজুমদার মজলিস-গৃহে গিয়া দেখিলেন সন্তোষবাবু এবং সাহেবী পোষাক-পরা এক ভদ্রলোক বসিয়া আছেন। সন্তোষবাবু নবীন মজুমদারের সহিত আগন্তুকের পরিচয় করিয়া দিলেন।

আগন্তুকের নাম তারক রাও। ইনি ছত্রী। ইঁহাদের নিবাস নদীয়া জেলায়। ইঁহার পিতা বর্ম্মাপ্রবাসী ছিলেন। তারক রাও বর্ম্মায় জন্মগ্রহণ করেন। অতি শৈশবে একবার বাংলা দেশে আসিয়াছিলেন। রেঙ্গুনে তারক রাওর পিতার কারবার ছিল। তিনি বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তারক রাও সাহিত্য ও দর্শন শাস্ত্রে এম্, এ উপাধি লাভ করিয়াছেন। দর্শনশাস্ত্র, সঙ্গীত, কবিতা, প্রাচীন ইতিহাস, প্রাচীন মুদ্রা ও শিলা-লিপি আলোচনায় তারক রাও অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করেন। ইঁহার পিতা প্রথম শ্রেণীর রত্ন-পরীক্ষক ছিলেন। কয়েকটি বহুমূল্য প্রস্তর তিনি সংগ্রহ করেন। তাঁহারা পরম সুখে রেঙ্গুনে বাস করিতেছিলেন, তারক রাও প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। কোথা হইতে কুগ্রহের দৃষ্টি পড়িল। তারক রাওয়ের পিতার প্রতিদ্বন্দ্বী একজন ব্যবসাদারের কুচক্রে তারকের পিতাকে বর্ম্মা গভর্ণমেণ্টের কুনজরে পড়িতে হইল। বর্ম্মা গভর্ণমেণ্ট তারকের পিতাকে আদেশ করিলেন, "এক মাসের মধ্যে কারবার গুটাইয়া বর্ম্মা ত্যাগ করিতে হইবে। বর্ম্মায় আর আসিতে

পাইবে না, কোনও কারবার করিতে পারিবে না, কোন সম্পত্তিও রাখিতে পারিবে না। এই আদেশ অমান্য করিলে সমস্ত সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত হইবে ও তুমি পুত্রসহ কারাগারে আবদ্ধ হইবে।" তারকের পিতা ও তারক এই আদেশের প্রতিবাদ করিয়া ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টের নিকট তারযোগে প্রতীকারের প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু কোনই ফল হইল না। অগত্যা, তারক রাও ও তাঁর পিতা রেঙ্গুনে সমস্ত সম্পত্তি জলের দরে বিক্রয় করিয়া নোটে, মোহরে ও টাকায় তিন লক্ষ টাকা, কয়েকটি বহুমূল্য রত্ন এবং দুই বাক্স প্রাচীন পুস্তকের পাণ্ডুলিপিসহ রেঙ্গুন হইতে যাত্রা করিতে বাধ্য হইলেন। পথিমধ্যে পুলিশে চার বার তাঁহাদের সমস্ত লগেজ খুলিয়া জিনিষপত্র তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া তবে ছাড়িল। এমন কি তাঁহাদের পরিচ্ছদ পর্য্যন্ত পরীক্ষা করিল। কয়েক দিবস পূর্ব্বে সমুদ্রে ঝড় হইয়া জাহাজ ডুবিয়া যায়। তারক রাও কোনও রকমে বাঁচিয়া কলিকাতায় আসিয়াছেন; তাঁর পিতা রক্ষা পান নাই। গত পরশ্ব সন্ধ্যার সময় সন্তোষবাবুর সহিত পরিচয় হয়। গতকল্য ঝড়-বৃষ্টির সময় খিদিরপুরে সন্তোষবাবুর এক আত্মীয়ের বাসায় ছিলেন। সন্তোষবাবু তাঁর সব কথা শুনিয়া তাঁকে নবীন মজুমদারের নিকট আনিয়াছেন। নবীনবাবু কাজের লোক। তারক রাও তুল্য গুণী লোকের বুদ্ধি যাতে মাঠে মারা না যায় তার উপায় অবশ্যই নবীন মজুমদার করিতে পারিবেন।

নবীন মজুমদার তারক রাওয়ের বৃত্তান্ত নিবিষ্টচিত্তে শুনিয়া

তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার কাছে এখন কিছু আছে, না জাহাজে ডুবিয়া সব গিয়াছে ?"

তারক রাও বলিলেন, "নিত্য-ব্যবহার্য্য জিনিষ কিছুই নাই, নগদ টাকা মোহর বা নোট সমস্তই ভাসিয়া গিয়াছে। থাকিবার মধ্যে কয়েকটি বহুমূল্য রত্ন আছে এবং আমার হাতে এই যে আংটিটি দেখিতেছেন, ইহাই রহিয়াছে। এই অঙ্গুরীটি বহুমূল্য প্রস্তরখচিত। এতগুলি মহামূল্য রত্ন আমার কাছে থাকা সত্ত্বেও সন্তোষবাবুর অনুগ্রহ না হইলে এই দুই দিন আমি খাইতেও পাইতাম না, কিংবা নূতন পোষাক কিনিতেও পারিতাম না। বহুমূল্য রত্নের গ্রাহক সহজে পাওয়া যায় না।"

নবীন মজুমদার। আমি অবিবাহিত। এই গৃহের সংলগ্ন একটি ক্ষুদ্র গৃহে আমি বাস করি। আপনি অসুবিধা বোধ না করিলে আমার সঙ্গে বাস করিতে পারেন। খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্তও এখানে হইতে পারে। আমাদের দেশী খাদ্য খাওয়ার অভ্যাস যদি আপনার না থাকে, তাহা হইলে কোন হোটেলে বন্দোবস্ত করিতে পারেন।

তারক রাও। না, আমার সাহেবী খানা খাওয়ার অভ্যাস নাই, পোষাকে সাহেবী হইলেও খানা-পিনায় সাহেব বনিয়া যাই নাই, আপনার সঙ্গেই থাকিব। শীঘ্রই হ্যাট্কোট্ ছাড়িয়া আপনাদের মত ধুতি-চাদর ধরিব।

নবীন মজুমদার। কি করিবেন তার কিছু স্থির করিয়াছেন ?

তারক রাও। না, আপনি বলুন না কি করি? আমার মনের অবস্থা বড় খারাপ।

নবীন মজুমদার। তা' ত হবেই, কিন্তু বসিয়া থাকিবেন কত দিন। আমার মনে হয় যে আপনি যদি খবরের কাগজে প্রবন্ধ লিখেন, আমার ছাপাখানার প্রুফ্ সংশোধনের ভার লন, তাহা হইলে আজ হইতেই আপনার কিছু কিছু আয় হয়। তাতে আপনার গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয় অনায়াসে নির্ব্বাহ হইতে পারে। তারপর ধীরে-সুস্থে আপনার রত্নগুলি বিক্রয় করার চেষ্টা করা যাইতে পারিবে।

তারক রাও। সে কথা মন্দ নয়। কিন্তু এ বহুমূল্য রত্নগুলি সঙ্গে করিয়া বেড়ান তো নিরাপদ নয়।

নবীন মজুমদার। আপনি ইচ্ছা করিলে আমার লোহার সিন্দুকে সেগুলি রাখিতে পারেন। আমি তা আমার খাতায় জমা করিয়া লইব এবং আপনাকে একখানি রসিদ দিব।

তারক রাও। রসিদে দরকার নাই।

নবীন মজুমদার। না, রসিদ লইতে হইবে। কাজ দস্তুরমত করাই ভাল। আপনার হাত-খরচার জন্য আপনি বরং আমার নিকট হইতে আগাম কিছু লইতে পারেন।

তারক রাও। তা মন্দ নয়, সেই বন্দোবস্তই ঠিক হইল।

তখন তারক রাও পাঁচটি বহুমূল্য রত্ন নবীন মজুমদারের হাতে দিলেন। তিনি সেগুলির ঔজ্জ্বল্য কিয়ৎক্ষণ মুগ্ধ নয়নে দেখিয়া সেগুলি একটি ছোট হাত-বাক্সে রাখিয়া সেই বাক্সের চাবি বন্ধ করিয়া

চাবিটি তারক রাওকে দিলেন এবং সেই বাক্সটি একটি লোহার সিন্দুকে রাখিয়া রত্ন সম্বন্ধে একখানি রসিদ তারক রাওকে লিখিয়া দিলেন। এই সকল কাজ হইতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিল। এমন সময় বিপিন সেখানে উপস্থিত হইল এবং জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে তারক রাওর দিকে চাহিয়া রহিল।

নবীন মজুমদার সংক্ষেপে বিপিন ও তারক রাওয়ের পরস্পরের সঙ্গে পরিচয় করিয়া দিলেন। বিপিন ঐ দিবস রাত্রে তাঁহাদের শ্যামপুকুরের বাটীতে আহারের জন্য তারক রাওকে, সন্তোষ মজুমদারকে ও নবীন মজুমদারকে নিমন্ত্রণ করিয়া গেল এবং রাত্রি আটটার পূর্ব্বে সেখানে পৌঁছিবার জন্য বিশেষ করিয়া বলিল; কারণ গান বাজনা ও অন্যবিধ আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা ছিল।

৬

কয়েক মাস কাটিয়াছে। তারক রাও আজকাল মাসিক চারি শত টাকা উপার্জ্জন করিতেছেন। নবীন মজুমদারের "হক্ কথায়" নিয়মিত প্রবন্ধ লিখিয়া মাসে পঞ্চাশ টাকা পান, প্রুফ সংশোধন করিয়া পান গড়ে মাসিক এক শত টাকা, একখানি ইংরাজী দৈনিকে প্রত্যহ একটি করিয়া প্রবন্ধ লিখিয়া পান মাসে এক শত টাকা এবং দুইজন বি, এ ক্লাসের ছাত্রকে সপ্তাহে চারি ঘণ্টা করিয়া দর্শন ও ইংরাজি-সাহিত্য পড়াইয়া পান মাসে দেড় শত টাকা। তথাপি অবিবাহিত তারক রাও কিছুই জমাইতে পারেন না, সবই খরচ করিয়া ফেলেন। নবীন মজুমদার তারক

রাওকে ব্যয় সংক্ষেপ করিতে উপদেশ দেন, কিন্তু তারক রাও তা' পারিয়া উঠেন না। আমোদ-প্রমোদে এবং পুস্তক ক্রয়ে তারক রাও প্রতি মাসে বহু অর্থ ব্যয় করেন।

নবীন মজুমদারের নিকট গচ্ছিত রত্নগুলি বিক্রয় না করিলে চলিতেছে না। অধ্যাপক সন্তোষবাবু জানাইলেন যে, বালি ষ্টেশন হইতে এক ক্রোশ পশ্চিমে দক্ষিণপাড়া নামক গ্রামে কুলকুণ্ডলিনী প্রসাদ রায় নামে একজন জমিদার বাস করেন। তিনি তাঁর একমাত্র কন্যা আত্রেয়ীকে লইয়া তাঁহার বৃহৎ অট্টালিকায় বাস করেন। আত্রেয়ী সুশিক্ষিতা, সংস্কৃতে অনারসহ বি, এ উপাধি প্রাপ্তা। কুলকুণ্ডলিনী প্রসাদ বাতিকগ্রস্ত লোক। তিনি বহু অর্থব্যয় করিয়া অতি প্রাচীন হস্তলিখিত সংস্কৃত গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছেন এবং তাঁর পত্নীর মৃত্যুর পর হইতে দ্বাদশ বৎসরের অধিক কাল বেদ ও শ্রীমদ্ভাগবত গীতার সম্পাদনে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন, তাঁর এই কার্য্যে আত্রেয়ী তাঁহাকে দুই বৎসর হইতে সাহায্য করিতেছেন। আত্রেয়ীর বয়স বাইশ বৎসর। এখনও বিবাহ হয় নাই। অপূর্ব্ব সুন্দরী, কিন্তু কিছু গম্ভীর প্রকৃতি। সর্ব্বদা বৃদ্ধ পিতার নিকটে থাকিয়া এইরূপ হইয়াছে বোধ হয়। কয়েক মাস হইতে কুলকুণ্ডলিনী প্রসাদ এমন একজন লোক খুঁজিতেছিলেন, যিনি তাঁহার বেদ ও গীতার সম্পাদন কার্য্যে প্রকৃত সাহায্য করিতে পারেন। সেজন্য পারিশ্রমিকস্বরূপ তিনি মাসিক দুই শত টাকা দিতেও প্রস্তুত।

তারক রাও কুলকুণ্ডলিনী প্রসাদের গ্রন্থ-সম্পাদনে সাহায্য

করিবার উপযুক্ত লোক মনে করিয়া, একদিন অপরাহ্নে সন্তোষবাবু তারক রাওকে সঙ্গে করিয়া দক্ষিণপাড়ায় গিয়া কুলকুণ্ডলিনী প্রসাদের সহিত তারক রাওয়ের পরিচয় করিয়া দিলেন। কুলকুণ্ডলিনী প্রসাদ তারক রাওয়ের বিদ্যা-বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া চমৎকৃত হইলেন। এক বৎসরের জন্য তাঁহাকে মাসিক দুই শত টাকা বেতনে নিযুক্ত করিলেন। স্থির হইয়া গেল, এক সপ্তাহ পর হইতে তারক রাও তাঁহার নূতন কার্য্যে ব্রতী হইবেন। প্রতিদিন দুই প্রহর হইতে বেলা ৫টা পর্য্যন্ত কাজ করিতে হইবে। এদিন তারক রাওয়ের সহিত আত্রেয়ীর দুই চারিটা কথা হইল মাত্র। তারক রাও আত্রেয়ীকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। আত্রেয়ীও যে সুরুচির পরিচায়ক বহুমূল্য পরিচ্ছদপরিহিত রূপবান্ তারক রাওকে দেখিয়া বিরক্ত হইল এমন বোধ হয় না। তারক রাও তখন ত্রিশ বৎসর অতিক্রম করেন নাই।

তারক রাও নিয়মিতরূপে দক্ষিণপাড়ায় আসিতেছেন। তিনি ও আত্রেয়ী উভয়ে মিলিয়া কুলকুণ্ডলিনী প্রসাদের গ্রন্থ সম্পাদন কার্য্যে সাহায্য করিতেছেন। তাঁদের কার্য্য এইরূপ:—বৃদ্ধ কুলকুণ্ডলিনী প্রসাদ বলিয়া যাইতেছেন, কখনও বা আত্রেয়ী, কখনও বা তারক রাও তাহা লিখিয়া যাইতেছেন, খানিক লিখা হইলে লিখিত বিষয় তাঁহাকে পড়িয়া শুনান হইতেছে, তিনি আবশ্যকমত কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিতেছেন। যেরূপ মন্থরগতিতে কার্য্য অগ্রসর হইতেছে, তাহাতে কত দিনে যে কার্য্য শেষ হইবে তাহার স্থিরতা নাই, কিন্তু বৃদ্ধের সেদিকে আদৌ দৃষ্টি নাই।

তারক রাও ও আত্রেয়ী ক্রমশঃ পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছেন, কিন্তু তাহা ভালবাসা কিনা কেহই বুঝিতে পারিতেছেন না। এ চার মাসে তাঁহারা উভয়ে ইহা জানিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের বিবাহে সামাজিক কোন বাধা নাই।

তারক রাও একদিন কথায় কথায় তাঁর রত্নগুলির কথা আত্রেয়ীকে জানান। আত্রেয়ী সেগুলি তাঁর পিতাকে জানাইতে নিষেধ করেন। তাহা হইলে তাঁর পিতার সেগুলি কিনিতে লোভ হইবে এবং তা' কিনিতে তাঁহাকে ঋণ করিতে হইবে। গরলাগাছার জমিদার হৃদয়ভূষণবাবুর কাছে গেলে তিনি রত্নগুলি কিনিতে পারেন। তাঁর অর্থের অভাব নাই, অথচ রত্ন সংগ্রহ করিবার আগ্রহ আছে। তারক রাও স্থির করিলেন, সময়মত হৃদয়ভূষণবাবুর নিকটে রত্নগুলি বিক্রয় করার প্রস্তাব করিবেন।

দক্ষিণপাড়ায় কার্য্য গ্রহণ করায় তারক রাওকে বি, এ ক্লাসের ছেলে দুটিকে পড়ান ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে। কুলকুণ্ডলিনী প্রসাদ স্ত্রী-বিয়োগের পর হইতে বাহিরের লোকের সহিত বড় একটা মিশিতেন না। আত্রেয়ীও পিতার নিকট থাকিয়া স্কুল ও কলেজের পড়াশুনা করিয়া এত বড় হওয়ায় সামাজিকতার ধার ধারিতেন না। তারক রাও চারি মাস ধরিয়া কুলকুণ্ডলিনী প্রসাদের বাড়ীতে যাতায়াত করিতেছেন, প্রায় প্রতিদিনই অপরাহ্ন পাঁচটায় সময় প্রায় পাঁচ ঘণ্টা পরিশ্রমের পর তিনি এখান হইতে রওনা হন, তথাপি বৃদ্ধ কুলকুণ্ডলিনী প্রসাদ অথবা তাঁর যুবতী কন্যা আত্রেয়ী, কাহারও একদিন এ কথা মনেও হয় নাই যে, স্বজাতির ছেলেকে

একদিন একটু মিষ্টিমুখ করান উচিত। কার্য্যান্তে ফিরিবার সময় তারক রাও ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর হইতেন। কলিকাতায় ফিরিতে সাতটা রাত্রি হইত। তাই তিনি বালি ষ্টেশনে কিছু জলযোগ করিয়া যাইতেন।

বালি ষ্টেশনের অতি নিকটে ভদ্রলোকদের জলযোগের একটি সুন্দর স্থান ছিল। সনাতন সিং নামক এক ব্যক্তির একটি দোকান সেখানে ছিল। সেই দোকানে একটু বেশী দরে বিস্কুট, পাঁউরুটি, চা, চুরুট, সন্দেশ প্রভৃতি সর্ব্বদা বিক্রয় হইত। দাম একটু বেশী লইলেও সনাতন সিং জিনিষগুলি দিত খাঁটি। তার দোকানে ভদ্রলোকদের বসিয়া খাইবার জন্য দুইটি সুসজ্জিত কক্ষ ছিল। সেই কক্ষে বসিয়া পানভোজন করিলে সেজন্য অতিরিক্ত কিছু দিতে হইত। তারক রাও সনাতন সিংএর দোকানের কক্ষে বসিয়া প্রায় প্রতিদিন জলযোগ করিতেন। দু'চার দিনের মধ্যে তারক রাও সনাতনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। কারণ সচরাচর তারক রাও উৎকৃষ্ট জিনিষ ফরমায়েস করিতেন।

কোন দিনই তারক রাও সনাতনের দোকানে ৪।৫ টাকার কম দিয়া যাইতে পারিতেন না। কাজেই সনাতন তারক রাওকে একটু বেশী রকম খাতির করিত। সে তাহার দ্বিতীয় পক্ষের পত্নী ও প্রথমা স্ত্রীর গর্ভজাতা কন্যা সুধীরাকে বলিয়া রাখিয়াছিল যে, তার অনুপস্থিতিতে রাওবাবু দোকানে আসিলে তাঁর যেন আদর যত্নের ত্রুটি না হয়। সনাতনের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর বয়স ছিল উনিশ বছর। সে নেহায়েৎ দায়ে না পড়িলে দোকানে বসিত না। সনাতনের

অনুপস্থিতি সময়ে সুখীয়া দোকানের কাজ চালাইত। যে সময়ের কথা বলা হইতেছে তখন সুখীয়ার বয়স পনের বছর। তার বর্ণটি তপ্তকাঞ্চনের ন্যায়, চক্ষু দুটি আকর্ণবিস্তৃত, মুখের গঠন নিখুঁত, শারীরিক পরিশ্রম করে বলিয়া স্বাস্থ্য অটুট। সুন্দরী আত্রেয়ীর কাছ হইতে আসিয়া সুখীয়াকে দেখিয়া তারক রাওয়ের মনে হইত

"শুদ্ধান্ত দুর্লভমিদং বহুরাশ্রমবাসিনো যদি জনস্ত
দূরীকৃতা খলু গুণৈরুদ্যানলতা বনলতাভিঃ।"

সুখীয়ার সহিত তারক রাও হাসিয়া কথা কহিতেন, তাহাকে কত ছবি দিতেন, সুখীয়াও তারক রাওকে তিনি যে মূল্য দিতেন তার কিছু অতিরিক্ত দিত। একদিন সনাতনের দোকানে জলযোগ করিতে গিয়া তারক রাও দেখিলেন যে, দোকানে সনাতন নাই, সুখীয়া আছে। সুখীয়া বলিল, তার সৎমাকে লইয়া তার বাবা তারকেশ্বর গিয়াছে। সেদিন তাহারা ফিরিবে না। সেদিন তারক রাও অন্যদিন অপেক্ষা বেশী জিনিষের ফরমাইস দিয়া সুখীয়ার সঙ্গে গল্প করিতে করিতে খাইতে লাগিলেন। টিকিটের ঘণ্টা পড়িল। সুখীয়া বলিল, "রাওবাবু, তোমার খাওয়া ত শেষ হ'ল না। ওদিকে টিকিটের ঘণ্টা পড়লো যে।" তারক রাও যেন তৎপূর্ব্বে টিকিটের ঘণ্টা নিজে মোটেই শুনিতে পান নাই এরূপ ভাব দেখাইয়া ব্যস্ত হইয়া খাওয়া অসম্পূর্ণ রাখিয়া টেবিল ছাড়িয়া উঠিয়া ষ্টেশনের দিকে ছুটিলেন। কিন্তু তিনি প্ল্যাটফর্ম্মে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই ট্রেণ ছাড়িয়া দিল। তখন তারক রাও সনাতনের দোকানে ফিরিয়া গিয়া তাঁহার অভুক্ত খাবারগুলির সম্মুখে বসিয়া

পড়িলেন। তাঁহাকে ফিরিতে দেখিয়া সুধীরা অত্যন্ত খুসী হইল। সে এতক্ষণ ষ্টেশনের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়াছিল। তারক রাও অবশিষ্ট খাদ্যগুলি ধীরে সুস্থে খাইয়া একটি বহুমূল্য চুরটে অগ্নি-সংযোগ করিয়া টানিতে সুরু করিলেন। সুধীরা জিজ্ঞাসা করিল, "কলকাতা যাবার ট্রেণ এর পরে কখন তা জানেন ?"

তারক রাও। কেন ? আটটা রাত্রে।

সুধীরা। আজ রবিবার না ?

তারক রাও। হাঁ, রবিবার। তাতে হইল কি ?

সুধীরা। হবে আবার কি ? আজ আর রাত্রি আটটায় ট্রেণ পাবেন না। আজ রবিবার ব'লে ও ট্রেণ বন্ধ—তা বুঝি আপনি জানেন না ?

তারক রাও যেন অত্যন্ত মুস্কিলে পড়িয়াছেন এইরূপ ভাব মুখে আনিয়া বলিলেন, "তাহা হইলে ত বড় মুস্কিল হইল। আজ কলিকাতা যাইবার ট্রেণ কখন পাইব বল ত ?"

সুধীরা। সেই রাত্রি সাড়ে বারটায় সময়। সে ত ট্রেণ নয়—গরুর গাড়ীরও অধম, এমন আস্তে চলে! কলকাতা পৌঁছাতে আপনার ভোর হ'য়ে যাবে।

তারক রাও। (মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে) তাই ত, এখন করি কি ? যাই কোথা ? খাই কি ? রাত্রি সাড়ে বারটা পর্য্যন্ত জাগিয়া থাকিই বা কেমন করিয়া ? রাত্রে ভাত না হইলে আমার মোটেই চলে না। হাঁ সুধীরা, তুমি আজ রাত্রে চারটি ভাত খাওয়াতে পার না ?

সুধীয়া। আপনি আমার রাঁধা ভাত খাবেন?

তারক রাও। খাইব না কেন? তোমরা ত ছত্রি, আমিও যে ছত্রি।

সুধীয়া। বলেন কি? আপনি ছত্রি। আপনাকে দেখে তো বাঙ্গালীবাবু ব'লে মনে হয়।

তারক রাও। তা ত হবেই। আমার ঠাকুর বাবার বাবা গাজিপুর জিলা হইতে বাঙ্গালা দেশে আসিয়া বাঙ্গালা দেশেই রহিয়া যান। কাজেই আমরা একদম বাঙ্গালী বনিয়া গিয়াছি। তোমাদের ঘর কোন্ জিলায়?

সুধীয়া। শুনেছি আমার দাদী আমার বাবাকে দু'বছরের ছেলে নিয়ে এখানে আসেন। আমাদের বাড়ী নাকি আগে ছিল মজঃফরপুর জেলায়। আমি বালি ছেড়ে আর কোথাও যাই নাই। বালি আমার খুব ভাল লাগে।

তারক রাও। আচ্ছা সুধীয়া, আজ ত আমি তোমার রাঁধা ভাত খাব, কি খাওয়াবে বল দেখি?

সুধীয়া। আপনি কি খেতে চান বলুন না।

তারক রাও। তুমি ছেলেমানুষ। আমার জন্ত কষ্ট করিয়া তোমাকে রাঁধিতে হইবে না। বরং তোমাদের ময়রাকে বলিয়া দাও আমার জন্ত কয়েকখানা খাস্তার লুচি ভাজিয়া দিক্।

সুধীয়া। তা হবে না। তা হ'লে আমি রাগ করব। আমাকে ত নিজের জন্তে রাঁধতে হবেই। বলুন না, আপনি কি খাবেন?

তারক রাও। তুমি যা খাওয়াবে তাই খাব।

সুধীয়া। আপনি মাছ খান কি?

তারক রাও। ভাত খাইবার সময় রাঁধা মাছ পাইলে খাই।

সুধীয়া খিল খিল করিয়া হাসিয়া বলিল, "যান, আমি কি আপনাকে কাঁচা মাছ খাওয়ার কথা জিজ্ঞাসা করেছি? কাঁচা মাছ বুঝি কেউ খায়?"

তারক রাও। খায় বই কি।

সুধীয়া। কাঁচা মাছ খায়! কে বলুন ত?

তারক রাও। কেন, কুকুর, বিড়াল।

এই উত্তর শুনিয়া সুধীয়ার এমন হাসি পাইল যে, সে ঘর হইতে ছুটিয়া পলায়ন করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে আসিয়া বলিল, "রাত্রি সাড়ে নয়টার সময় আপনি ভাত পাবেন। আমি রাঁধতে চ'ল্লাম। আপনি এ ঘরে ব'সে থাকুন।" তারক রাও পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া দেখিলেন, আটটা বাজিয়া গিয়াছে।

তারক রাও তখন টেবিলের উপর পা দু'খানি তুলিয়া দিয়া চুরট টানিতে টানিতে সুধীয়া এবং আত্রেয়ীর রূপের তুলনা করিতে লাগিলেন। সময় যে কেমন করিয়া কাটিল, তিনি তাহা কিছুই টের পাইলেন না। সুধীয়া আসিয়া যখন ডাকিল, "রাওবাবু, ভাত রাঁধা হ'য়েছে। এখন খাবেন কি?" তখন তারক রাও চমকিয়া উঠিলেন। সুধীয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ভাত টেবিলে খাবেন, না আসনে ব'সে খাবেন?"

তারক রাও। চেয়ারে বসিয়া টেবিলের উপর ভাত রাখিয়া খাইয়া তৃপ্তি পাওয়া যায় না। আমি মাটিতে বসিয়া ভাত খাইব।

সুথীয়া। "তা হ'লে একটু বসুন। আমি ঠাঁই ক'রে আপনাকে ডেকে নিয়ে যাচ্চি।" এই কথা বলিয়া চলিয়া গিয়া মিনিট পাঁচ পরে ফিরিয়া আসিয়া সুথীয়া তারক রাওকে বাড়ীর মধ্যে লইয়া গিয়া একটি খাপড়ার ঘরের সানবাঁধা মেঝেতে পাতা কম্বলাসনের উপর তাঁহাকে বসিতে বলিল। তারক উপবেশন করিলেন। সুথীয়া তখন তারককে পরিবেশন করিতে লাগিল। ডাল, ভাত, মাছের ঝোল, আলুর দম, বেগুন ভাজা, আলুবোখ্‌রার চাটনী, এক বাটী ক্ষীর, চারিটা বড় রসগোল্লা—এই সকল জিনিষ একে একে পাতের চতুষ্পার্শ্বে সাজাইয়া দিল। তারক রাও খাইবেন কি, মুগ্ধনয়নে সুথীয়ার সুচারু অঙ্গের ললিত ভঙ্গি দেখিতে লাগিলেন। তারক রাও কিছু না খাইয়া তাহার দিকে চাহিয়া আছে দেখিয়া সুথীয়া হাসিয়া বলিল, "আমার দিকে চেয়ে থাক্‌লে আপনার ক্ষিদে যাবে না, খেতে বসুন।" তারক রাওয়ের তখন জ্ঞান হইল। তিনি খাদ্যদ্রব্যের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "সুথীয়া, তুমি কি আমাকে রাক্ষস মনে করিয়াছ? তুমি যা দিয়াছ তার সিকিও আমি খাইতে পারিব না। তুমি এর বার আনা তুলিয়া লও। কেন অনর্থক এত জিনিষ নষ্ট করিবে।"

সুথীয়া বলিল, "আপনি খান না। নষ্ট হয় হবে।"

তারক রাও। তুমি ছেলেমানুষ, অনর্থক জিনিষ নষ্ট করিয়া কি হইবে। কতকটা জিনিষ তুলিয়া লও। আচ্ছা এক কাজ কর। থালে যা ভাত আর আলুর দম দিয়াছ তাহা থাকুক, বাটীতে করিয়া যে সকল জিনিষ দিয়াছ তা সরাইয়া লও, আমি যেমন

যেমন চাহিব, তুমি অমনি বাটী হইতে আমার পাতে ঢালিয়া দিও। তাহা হইলে জিনিষও অনর্থক নষ্ট হইবে না। বাটীও এঁটো হইবে না। আমিও তোমার সঙ্গে গল্প করিতে করিতে খাইতে পারিব। তুমি বরং রান্নাঘরের কপাট বন্ধ করিয়া দিয়া আইস।”

সুখীয়া দেখিল এ যুক্তি মন্দ নয়। সে রান্নাঘরের কপাট বন্ধ করিয়া আসিয়া তারক রাওয়ের সম্মুখে বসিয়া তাঁহাকে যত্ন করিয়া খাওয়াইতে প্রবৃত্ত হইল। আহারে বসিবার পূর্ব্বে তারক রাও ডাইন হাতের অনামিকা হইতে আংটিটি খুলিয়া আসনের উপর রাখিলেন। তাহা দেখিয়া সুখীয়া বলিল, “ও কি কর্‌ছেন; আংটি হাত হ’তে খুল্‌লেন কেন? মাগো, আংটির ওপরকার পাথরটা ঝক্‌মক্ কর্‌ছে কেমন?”

তারক রাও। আংটি হাতে দিয়া ডাল, ভাত, মাছ তরকারী খাইলে আংটি বড় ময়লা হইয়া যায়। আংটি ধুইয়া পরিষ্কার করা বড় ল্যাঠা। তাই খাবার সময় আংটি খুলে রেখে খাই।”

সুখীয়া। বাঁ হাতের আঙ্গুলে পরুন না। নৈলে যদি আঁচিয়ে উঠে হাতে দিতে ভুলে যান ত হারিয়ে যেতে পারে।

তারক রাও। ভবিষ্যতে তোমার উপদেশমত চলিবার চেষ্টা করিব। আজ ডান হাত এঁটো করিয়া ফেলিয়াছি।

এক ঘণ্টা ধরিয়া তারক রাও আহার করিয়া আচমনান্তে বাহিরের টেবিল চেয়ার দ্বারা সুসজ্জিত কক্ষে গিয়া বসিলেন। আংটিটি ইচ্ছা করিয়াই লইয়া যাইতে ভুলিয়া গেলেন। সুখীয়া আসনে আংটি পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া পান দিতে যাইবার সময়

সেটি আসন হইতে তুলিয়া লইয়া গিয়া তারক রাওকে বলিল, "দেখুন ত, আপনি কেমন অসাবধান। এমন দামী আংটি আসনে ফেলে এসেছিলেন।"

তারক রাও। ফিরিয়া পাইলাম ত। এখন আমার হাতে আংটিটা পরাইয়া দাও।

সুধীয়া তাহাই করিল। অমনি তারক ষ্টেশন হইতে ফিরিবার সময় যে বেলফুলের মালাগাছি কিনিয়াছিলেন, সেই মালাগাছি সুধীয়ার গলায় পরাইয়া দিলেন। সুধীয়া একটু পিছাইয়া গেল।

তারক বলিলেন, "পুরাকালে ক্ষত্রিয়দের মধ্যে অনেকেরই আংটি বদল করিয়া বিবাহ হইত।"

সুধীয়া। আজকাল বুঝি তা আর হয় না?

তারক রাও। একবারে হয় না তা বলিতে পারি না।

মুগ্ধা বালিকা তারকের এ কথায় বেদবাক্যবৎ বিশ্বাস স্থাপন করিল। তারক পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া দেখিলেন, রাত্রি প্রায় সাড়ে এগারটা। তখন সুধীয়ার নিকট বিদায় লইয়া ষ্টেশন অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

৭

বিপিনের বিবাহের পর তিন বৎসর অতীত হইয়াছে। বিপিন তার শ্বশুরের এটর্ণীর ফার্ম্মে এটর্ণী হইয়াছে। অমরবাবু পেন্‌সন লইয়া কলিকাতায় ও পল্লীগ্রামের বাটীতে বাস করিতেছেন। তিনি বেশীর ভাগ পল্লীগ্রামেই বাস করেন। বিপিন শ্যামপুকুরের বাড়ী হইতে হাইকোর্ট যায়। বিপিনের মাতা পীড়িত। তিনি একরূপ

চলৎশক্তিরহিত। ছোট বধূর কাছে থাকিলে তাঁর সেবা-শুশ্রূষা উত্তমরূপ হয় বলিয়া তিনি শ্যামপুকুরের বাটীতেই থাকেন। সরলা তার শাশুড়ীকে আন্তরিক ভক্তি করে। সরলার দৃষ্টান্তে তার শ্বশুরবাড়ীর লোকদের চালচলন বদলাইয়া গিয়াছে, এখন বাড়ীর লোকেরা পরস্পরের দরদ বুঝিতে শিখিয়াছে। সরলার একটি পুত্রসন্তান হইয়াছে। ঠাকুরমা আদর করিয়া তার নাম রাখিয়াছেন 'নন্দদুলাল'।

নবীন মজুমদারের সাপ্তাহিক "হক্ কথা"খানি দৈনিকে পরিণত হইয়াছে। তিনি "Fairplay" নামক একখানি ইংরেজী দৈনিক বাহির করিয়াছেন। স্বাধীনচেতা সংবাদপত্র-পরিচালক বলিয়া তাঁহার খ্যাতি হইয়াছে। আবশ্যক হইলে তিনি গভর্ণমেণ্টের কার্য্যের তীব্র সমালোচনা করেন, কিন্তু তাই বলিয়া অকারণে বা সামান্য কারণে গভর্ণমেণ্টের কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়া হৈ রৈ করেন না। তিনি স্পষ্টবাদী লোক। গভর্ণমেণ্টেরই হউক বা দেশের লোকেরই হউক, তিনি কাহারও অন্যায় দেখিতে পারেন না। কংগ্রেসের তিনি একজন প্রধান পাণ্ডা, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাকে গরম বা নরম কোন দলভুক্তই বলা যায় না।

তারক রাওয়ের আজকাল একাদশে বৃহস্পতি। তিনি একটি দর্শনবিষয়ক প্রবন্ধ লিখিয়া তাহা একখানি ইংরেজী মাসিকপত্রে প্রকাশ করিবার পর হইতেই বিদ্বৎ সমাজে তাঁর খুব আদর হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে মাসিক পাঁচ শত টাকা বেতনে দর্শন শাস্ত্রের

অধ্যাপক নিযুক্ত করিয়াছেন। এজন্য তাঁহাকে খবরের কাগজে প্রবন্ধ লেখা ও প্রুফ্ দেখার কাজ ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে। থিয়েটারে একখানি গীতিনাট্য, একখানি ঐতিহাসিক নাটক ও একখানি সামাজিক নাটক লিখিয়া দিয়া থিয়েটারের কর্ত্তাদের কাছে ছয় হাজার টাকা পাইয়াছেন। থিয়েটারের কর্ত্তরা তাঁহাকে মাসিক বেতনে নাট্যকার নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব করেন, কিন্তু তিনি সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।

তাঁর রত্নগুলি দেড় লক্ষ টাকায় বিক্রয় হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। কুলকুণ্ডলিনী প্রসাদের পত্তনীদারের বিশ্বাসঘাতকতায় তাঁর জমীদারী গভর্ণমেণ্ট-রাজস্বের দায়ে নীলাম হইয়া গিয়াছে। দক্ষিণপাড়ার বাড়ী ব্যতীত তাঁহার আর কোন সম্পত্তি নাই। তারক রাও সাহায্য না করিলে তাঁর এখন গ্রাসাচ্ছাদনেরও ব্যয় সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইবার উপায় নাই। এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় কুলকুণ্ডলিনী প্রসাদ হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দুঃখ এই যে, তিনি তাঁহার সঙ্কলিত বেদ ও গীতার সটীক সংস্করণ প্রকাশ করিয়া যাইতে পারিলেন না।

তারক রাও আত্রেয়ীকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিলেন। আত্রেয়ীর পিতা অভিজাত সম্প্রদায়ের লোক। তাঁরা পাঁচ পুরুষ জমীদার, তারক রাওয়ের মত একপ্রকার অজ্ঞাতকুলশীল সাধারণ অবস্থার লোকের হস্তে কন্যাদান করিবার কথা উঠায় তাঁর আত্মসম্মানে বিলক্ষণ আঘাত লাগিল, কিন্তু তিনি সমাজচ্যুত হইয়া নির্জ্জনে বাস করিতেন, সুতরাং স্বসমাজের জমীদার-সম্প্রদায়ের

কাহারও পুত্রের সহিত আত্রেয়ীর বিবাহ দিতে পারিবেন এরূপ ভরসা ছিল না। এতদ্ব্যতীত তিনি আত্রেয়ীকে যেভাবে শিক্ষিত করিয়াছিলেন, তাহাতে সেও যে পিতার নির্ব্বাচিত যে কোন পাত্রকে বিবাহ করিতে সম্মত হইবে এরূপ আশা করা সুদূর-পরাহত। এইরূপ অবস্থায় তারক যখন আত্রেয়ীকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিলেন তখন আত্রেয়ীর পিতার আত্মসম্মানে আঘাত লাগিলেও সকল দিক্ বিবেচনা করিয়া তারকের প্রস্তাবে সম্মত হওয়াই তিনি যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন, তবে সম্মতি দিবার পূর্ব্বে আত্রেয়ীর মত কি জানিতে চাহিলেন। জানিলেন, তারক রাওকে বিবাহ করিতে আত্রেয়ী সম্মত আছে।

এখন কথা উঠিয়াছে কি মতে বিবাহ হইবে। হিন্দুমতে বিবাহ দিতে কুলকুণ্ডলিনী প্রসাদ সম্মত নন। তারক রাও ব্রাহ্মমতে রেজেষ্টারী করিয়া বিবাহ করিতে সম্মত নন। অবশেষে এই স্থির হইল, উভয় কুল বজায় রাখিয়া বিবাহ হইবে। শালগ্রাম বাদ দিয়া হিন্দু বিবাহের মন্ত্র পড়াইয়া বিবাহ হইবে। আত্রেয়ীকে বিবাহ করিবার স্বপ্নে তারক রাও এখন বিভোর। ওদিকে সুখীয়া সম্পর্কিত ব্যাপারটা ক্রমশঃ জটিল হইয়া পড়িতেছে।

সুখীয়ার বাপ মারা গিয়াছে। সুখীয়ার সৎমার সঙ্গে তার বনিবনাও হয় না। তারক রাও পূর্ব্বের ন্যায় এখনও সন্ধ্যার পূর্ব্বে সনাতন সিংএর দোকানের সজ্জিত কক্ষে বসিয়া আহার করিয়া থাকেন এবং সুখীয়া তাঁর ফায়-ফরমাস খাটে।

একদিন তারক রাও দক্ষিণপাড়া হইতে ফিরিয়া সনাতনের

দোকানে গিয়া দেখিলেন, দোকান বন্ধ। সজ্জিত কক্ষটিও বন্ধ। বাড়ীতে জনমানবের সাড়া শব্দ নাই। নিকটবর্ত্তী দোকানদারের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, সুখীয়ার সৎমা সুখীয়াকে প্রহার করিয়া তাড়াইয়া দিয়া বাড়ী বন্ধ করিয়া বাপের বাড়ী বেড়াইতে গিয়াছে।

সুখীয়া কোথায়? তাহাকে ষ্টেশনের দিকে যাইতে দেখা গিয়াছে। এই সংবাদ পাইয়া তারক রাওয়ের মনটা বড়ই দমিয়া গেল। বাস্তবিকই তিনি সরলতার প্রতিমূর্ত্তি সুখীয়াকে ভালবাসিতেন। চিন্তিত মনে ষ্টেশনের দিকে গিয়া সামান্য অনুসন্ধানেই সুখীয়াকে বাহির করিলেন। তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, "আমি সব শুনিয়াছি। আমি যখন আসিয়াছি তখন আর তোমার কোন চিন্তা নাই। এখন তুমি আমার সঙ্গে আইস। ঘণ্টাখানেক ঐ ওয়েটিংরুমে বসিয়া থাক। রাত্রি আটটার গাড়ীতে তোমাকে কলিকাতা লইয়া গিয়া সব ঠিক করিয়া দিব। এখন বল আজ কি খাইয়াছ?" সুখীয়া জানাইল, সে সারাদিন কিছু খায় নাই, আর খাবার ইচ্ছা নাই। কিন্তু তারক রাও তা শুনিলেন না। নিকটবর্ত্তী দোকান হইতে এক ঠোঙা খাবার ও একঘটি জল আনাইয়া সুখীয়াকে খাইতে বলিলেন। সুখীয়া প্রথমে কয়েকবার আপত্তি করিয়া অবশেষে এই সর্ত্তে খাইতে সম্মত হইল যে, আগে তারক রাওকে কিছু খাইতে হইবে। অগত্যা তারক রাও কয়েকটা সন্দেশ গালে দিয়া এক গেলাস জল খাইয়া পান চিবাইতে চিবাইতে প্ল্যাট্‌ফর্ম্মে বেড়াইতে লাগিলেন। সুখীয়া

সেই অবসরে কিছু খাইল। দেখিতে দেখিতে ট্রেণ আসিল। সুধীয়াকে ইণ্টার ক্লাসের মেয়ে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া তারক রাও পাশের কামরায় উঠিয়া পড়িলেন।

৮

তারক রাওয়ের রত্নগুলির মূল্য দেড় লক্ষ টাকা শীঘ্র পাইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। নবীন মজুমদারের পরামর্শ অনুসারে এই দেড় লক্ষ টাকা তিনি বেঙ্গল ব্যাঙ্কে কিছুদিনের জন্য জমা রাখিবেন স্থির করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি উপলক্ষে বেলুড় মঠে মহোৎসবের আয়োজন হইয়াছে। কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে তারক রাও সেই উৎসব দেখিতে বেলুড় গিয়াছেন। তাঁরা মনের আনন্দে মঠের নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, এমন সময়ে দীর্ঘাকার এক সন্ন্যাসী তারক রাওয়ের সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, “আপনার নাম কি তারক রাও?” তারক রাও বলিলেন, “হাঁ।” তখন সন্ন্যাসী বলিলেন, “আপনার নামে একখানি চিঠি আছে।”

“কৈ দেখি” বলিয়া তারক রাও হাত বাড়াইলেন। সন্ন্যাসী তাঁর গৈরিক আলখেল্লার মধ্য হইতে একখানি খামে আঁটা চিঠি তারক রাওয়ের হাতে দিলেন।

চিঠির শিরোনামায় ইংরেজী অক্ষরে তারক রাওয়ের নাম লেখা। শিরোনামার হস্তাক্ষর দেখিয়া তারক রাওয়ের মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করিল। তিনি থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন।

প্রাণপণ চেষ্টায় আত্মসংবরণ করিয়া সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এ চিঠি আপনি কোথায় পাইলেন?” সন্ন্যাসী বলিলেন, “যিনি এই চিঠির লেখক তিনি ইহা আমার এক গুরুভাইকে দিয়া যান। আমার গুরুভাই মৃত্যুশয্যায় আমাকে এই চিঠি দিয়া ঐ চিঠি যাঁর উদ্দেশ্যে লিখিত তাঁর অনুসন্ধান করিয়া তাঁর হাতে দিতে অনুরোধ করেন।”

তারক রাও। আপনি আমাকে চিনিলেন কেমন করিয়া?

সন্ন্যাসী। “এখানে দুএকজনকে এই চিঠি দেখাইয়া এ কার চিঠি জিজ্ঞাসা করায় তাঁদের মধ্যে কয়েকজন আপনাকে দেখাইয়া দিল। আপনাকে আমি পূর্ব্বে দেখি নাই।” “এ চিঠির মধ্যে কি লেখা আছে আপনি জানেন?” মুখ নীচু করিয়া চিঠিখানির খাম ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে তারক রাও এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু উত্তর না পাইয়া মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিলেন, সন্ন্যাসী নাই। অনেক অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু সন্ন্যাসীর দেখা পাইলেন না। সেখানে চিঠিখানি পড়িতে সাহসে কুলাইল না। সর্ব্বাঙ্গ কেমন ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল। বন্ধুদের কাহাকেও কিছু না বলিয়া তিনি বরাবর ষ্টেশনে গিয়া দেখিলেন, কলিকাতা যাইবার গাড়ী প্ল্যাট্‌ফর্ম্মে লাগিয়াছে। তাড়াতাড়ি একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট কিনিয়া একটি নির্জ্জন কক্ষে উঠিয়া পড়িলেন। সেখানে বসিয়া মাথায় হাত দিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। চিঠি পড়িতে সাহস করিলেন না। ট্রেণ হাওড়া ষ্টেশনে পৌছিল। তাড়াতাড়ি ট্রেণ হইতে নামিয়া একখানি ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিয়া সটান্ বাসায়

আসিয়া শয়নকক্ষের দরজা বন্ধ করিয়া শুইয়া পড়িলেন। তাঁর মনে হইল বুঝি বা মূর্চ্ছা হইবে। আধ ঘণ্টাকাল নির্জ্জীবের মত বিছানায় পড়িয়া রহিলেন। ততক্ষণ সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। বাসার চাকর দরজায় ধাক্কা দিয়া বলিল, "বাবু, দরজা খুলুন। ঘরে আলো দিতে হবে।" তারক উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিলেন। ভৃত্য ঘরে আলো দিয়া গেলে তারক যাও হাত মুখ ধুইয়া কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া পকেট হইতে সন্ন্যাসীদত্ত চিঠিখানি বাহির করিয়া পড়িলেন। তাহাতে বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিত ছিল "বাপ্ তারক, তুমি কোথায় আছ জানি না। যদি ঈশ্বর তোমার প্রাণ রক্ষা করিয়া থাকেন, তোমার হতভাগ্য পিতার সন্ধান লইও। কখনও ঈশ্বরকে ডাকি নাই, এখন বিপদে পড়িয়া তাঁহাকে ডাকিয়া কথঞ্চিৎ শান্তি পাইতেছি। জাহাজ-ডুবিতে কোন প্রকারে রক্ষা পাইয়া আমার পরম শত্রু দুরাত্মা—এর হাতে পড়ি। সে পাপিষ্ঠ কৌশল করিয়া আমাকে মৌলমিনের পাগলা গারদে পুরিয়াছে। নরাধম পাগলা গারদের কর্তৃপক্ষদের কি বুঝাইয়াছে জানি না, কিন্তু আমি যা কিছু বলি না কেন, তারা সে সমস্তই উন্মাদের প্রলাপ বলিয়া মনে করে। যদি তুমি রক্ষা পাইয়া থাক, যদি এই চিঠি তোমার হস্তগত হয়, তাহা হইলে আমি যাহাতে মুক্ত হই তার চেষ্টা করিও। ইহাতে প্রচুর অর্থব্যয় হইবে। তাহাতে কাতর হইও না। তোমার কাছে আমার যে রত্নগুলি আছে সেগুলি বিক্রয় করিলে ন্যূনকল্পে তিন লক্ষ টাকা পাইবে। আমাকে মুক্ত করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিবে। সহজ মানুষ, অথচ

লোকে পাগল মনে করিয়া আমার সঙ্গে সেইরূপ ব্যবহার করিতেছে। বড় কষ্টে আছি। ইতি।

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীবরদাকান্ত রাও।"

চিঠিখানি পড়িয়া তারক রাও কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। তাঁহার মনে সুমতি ও কুমতির প্রবল দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইল। কুমতির জয় হইল। তারক স্থির করিলেন চিঠিখানির বিষয় ভাবিয়া অনর্থক মাথা খারাপ করিবেন না। যেমন চলিতেছেন তেমনি চলিবেন। কিন্তু চিত্ত প্রসন্ন হইল না। যখন তখন যেখানে সেখানে পালক পিতার কথা মনে পড়িয়া কেমন যেন সব উলট পালট করিয়া দিত।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার একমাস পরে রত্নের মূল্য দেড় লক্ষ টাকা আসিয়া পৌঁছিয়াছে। সেই টাকাগুলি হাতে পাইয়া তারকের মনে হইল "আমি এই টাকা লইয়া সুখের নদীতে সাঁতার দিব, আর যাঁর টাকা তিনি শত্রুর চক্রান্তে সহজ মানুষ হইয়াও পাগলা গারদে পচিয়া মরিবেন। না, তাহা হইতে দিব না। আমি আমার বন্ধুবান্ধবদের নিকট, আত্রেয়ীর নিকট, আত্রেয়ীর পিতার নিকট সকল কথা খুলিয়া বলিয়া এ স্থান ত্যাগ করিব। অথবা কাহাকে কিছু না বলিয়া চলিয়া গেলেই বা কি হয়? কিন্তু গভর্ণমেণ্টের চাকরী করিতেছি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া মাসিক সাত শত টাকা বেতন

পাইতেছি। কর্ত্তৃপক্ষকে কোন কথা না জানাইয়া যাই কেমন করিয়া? দীর্ঘকালের—এক বৎসরের ফার্লো লইলে চলিতে পারে। যদি জিজ্ঞাসা করে এত দীর্ঘকালের জন্য ছুটি চাই কেন? তখন কি বলিব? সব সত্য কথা বলিব কি? অথবা একটা মনগড়ান কথা বলিলেই চলিবে। কিন্তু মনগড়া কথা বলিয়া কার্য্য উদ্ধার করিলে এই বিপদ্ হয় যে, সেই মনগড়া কথা বজায় রাখিবার জন্য কত যে মনগড়া বলিতে হয় তাহার স্থিরতা নাই। সকল সময়ে সেই সকল মনগড়া কথার সামঞ্জস্য রক্ষা করা যায় না। না, যা থাকে ভাগ্যে এক বছরের ফার্লো লইয়া তিন চারি দিনের মধ্যে আমি মৌলমিন যাত্রা করিব। কিন্তু যদি বাবার দেখা না পাই, যদি তিনি বাঁচিয়া না থাকেন, যদি আমাকে বিপন্ন হইতে হয়? ঐ ত হইয়াছে মুস্কিল। নিশ্চিত বাবাকে উদ্ধার করিতে পারিব বুঝিলে কি আমি এতদিন বিলম্ব করিতাম, কখনই না। সুধু ভাবুকতার দ্বারা পরিচালিত হইলে কার্য্য উদ্ধার হয় না, বাবার চিঠি খানা লিখিত হইয়াছে তের মাস আগে। এখন তাঁর বয়স হইয়াছে একষট্টি বৎসর। তাঁর সুখের শরীর। কখন যৎসামান্য কষ্টও সহ্য করেন নাই। তিনি কি পাগলা গারদের মধ্যে অত কষ্টে থাকিয়া অত অখাদ্য খাইয়া বাঁচিয়া আছেন? কখনই না। তিনি বাঁচিয়া নাই, আমার মন বলিতেছে, তিনি বাঁচিয়া নাই। এই কথাই ঠিক। এইবার আমি নিশ্চিন্তমনে জীবনটা উপভোগ করিতে পারিব। অনর্থক ভাবিয়া মন খারাপ করিব না।" এইরূপে মনকে প্রবোধ দিয়া তারক যেন বাঁচিলেন। টাকাগুলি

আপাততঃ লোহার সিন্দুকে রাখিয়া সেগুলি কোন এক সুবিধাজনক ব্যাঙ্কে রাখিবার ইতি-কর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য পোষাক পরিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

৯

কুলকুণ্ডলিনী প্রসাদের শারীরিক অবস্থা দিন দিন খারাপ হইয়া আসিতেছে। তিনি বলিতেছেন যে, আর বেশীদিন বাঁচিবেন না, সুতরাং আত্রেয়ীকে তারক রাওয়ের হাতে যথাবিধি সমর্পণ করিয়া তিনি নিশ্চিন্তমনে মরিতে চাহেন।

সতেরই মাঘ তারক রাওয়ের সহিত আত্রেয়ীর বিবাহের দিন স্থির হইয়াছে। বৃদ্ধ কুলকুণ্ডলিনী প্রসাদের ইচ্ছা ছিল তাঁহার দক্ষিণপাড়ার বাড়ী হইতে শুভবিবাহ হয়, কিন্তু তাহার লোকজনের একান্ত অভাব ও দক্ষিণপাড়ায় বিবাহ হইলে তাঁহার বন্ধুদের তেমন সাহায্য পাইবেন না বলিয়া কলিকাতা হইতে বিবাহ হইবে স্থির হইয়াছে।

শ্যামপুকুরে বিপিন যে বাটীতে বাস করেন, সেই বাটীর সংলগ্ন একটি বাটী এক মাসের জন্য ভাড়া করা হইয়াছে।

কুলকুণ্ডলিনী প্রসাদ কন্যা আত্রেয়ী ও কয়েকজন ভৃত্যসহ সেই বাড়ীতে আসিয়াছেন। তাঁহার আত্মীয় কুটুম্ব বেশী ছিল না, যাহারা ছিল তাহাদের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা ছিল না। বিপিনের পত্নী সরলা এবং সরলার অনুরোধে ডাক্তার হরেন্দ্রবাবুর পত্নী ইন্দ্রলেখা আত্রেয়ীর বিবাহের রাত্রে কন্যাপক্ষের স্ত্রীলোকদিগের

করণীয় সকল কার্য্যের ভার লইয়াছেন। বিপিন বাহিরের বন্দোবস্ত করিবে বলিয়াছে।

বরকর্ত্তা হইয়াছেন নবীন মজুমদার। যথাসময়ে আত্রেয়ীর সহিত তারক রাওয়ের বিবাহ হইয়া গেল। বাঙ্গালী কোন ব্রাহ্মণকে পুরোহিত পাওয়া গেল না। একজন দ্রাবিড়ী ব্রাহ্মণ পৌরোহিত্য করিলেন। গোঁড়া হিন্দুসম্প্রদায়ের বড় একটা কেহ এ বিবাহে যোগ দিলেন না। পল্লীগ্রাম হইলে এরূপ বিবাহে কত গোলযোগ হয়, কিন্তু সে সব বালাই কলিকাতায় বড় একটা নাই।

বিবাহান্তে তারক রাও আত্রেয়ীকে লইয়া পুরী ও ভুবনেশ্বরে বেড়াইতে গেলেন। এটা কতকটা সাহেবী কায়দা। তারক রাও যখন যেভাবে চলা সুবিধা বোধ করিতেন সেইভাবে বেশ মানাইয়া চলিতেন। পুরী ও ভুবনেশ্বরে দুই সপ্তাহ কাল পরমানন্দে যাপন করিয়া নবদম্পতী দক্ষিণপাড়ায় ফিরিলেন। বিবাহের পূর্ব্বে তারক রাও এক মাসের ছুটি লইয়াছিলেন। তখনও দুই সপ্তাহের ছুটি ছিল। ছুটির বাকি কয়টা দিন তারক রাও আত্রেয়ীর সাহচর্য্যে দক্ষিণপাড়ায় কাটাইতেছেন।

এই সময়ে একদিন মধ্যাহ্নভোজনান্তে আচমন করিবার সময় কুলকুণ্ডলিনী প্রসাদ হঠাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। উপযুক্ত ডাক্তার আসিয়া চিকিৎসা করায় তিন ঘণ্টা পরে তাঁর মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল, কিন্তু তিনি অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন। ডাক্তার বলিলেন, "রোগী বড় জোর দুই তিন দিন বাঁচিবেন। কুলকুণ্ডলিনী

প্রসাদও তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি কন্যা, জামাতা ও ডাক্তারকে ডাকিয়া উইল করার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। এটর্ণী বিপিনকে তখনই তার করা হইল।

বিপিন আসিয়া কি মর্ম্মে উইল করিতে হইবে জিজ্ঞাসা করিল। কুলকুণ্ডলিনী প্রসাদের দক্ষিণপাড়ার প্রকাণ্ড অট্টালিকা, তিন সহস্রাধিক বহুমূল্য পুস্তক সম্বলিত লাইব্রেরী, দশহাজার টাকার জীবনবীমা এবং অনুমান ছয় হাজার টাকার ঋণ ব্যতীত আর কিছু ছিল না। তাঁর জমীদারীটি রাজস্বের দায়ে পূর্ব্বেই নীলাম হইয়া গিয়াছিল। কুলকুণ্ডলিনী প্রসাদের অভিপ্রায় অনুসারে বিপিন যে উইল প্রস্তুত করিল তাহার স্থূলমর্ম্ম এইরূপ :—

(১) "জীবন-বীমা দশহাজার টাকা আত্রেয়ী পাইবে, সেই টাকা হইতে ঋণশোধ করিতে হইবে। গৃহে পুস্তক ব্যতীত অন্যান্য যে সকল অস্থাবর সম্পত্তি আছে তৎসমস্তই আত্রেয়ীর হইল।

(২) দক্ষিণপাড়ার প্রকাণ্ড বাড়ীটি তারক ও আত্রেয়ী উভয়কে সমান অংশে দেওয়া হইল।

(৩) লাইব্রেরীটির সম্পূর্ণ ভার তারকের হস্তে প্রদত্ত হইল। কুলকুণ্ডলিনী প্রসাদের বড় সাধের বেদ ও গীতার সটীক সংস্করণ প্রকাশ করিবার জন্য তারককে অনুরোধ করা হইল। প্রকাশিত হইলে পরলোকে তাঁহার আত্মা তৃপ্ত হইবে।

(৪) তারক রাও একজিকিউটার হইলেন।" এই মর্ম্মে উইল লিখিত হইল। কুলকুণ্ডলিনী প্রসাদ তাহা নিজে পড়িয়া তাহাতে দস্তখত করিলেন এবং সেই উইলে এটর্ণী বিপিন ঘোষ,

ডাক্তার হরেন্দ্রকুমার এবং দক্ষিণপাড়া নিবাসী আরও তিনজন সাক্ষী হইলেন।

উইল সম্পাদন করিবার পরদিবস অপরাহ্ণ চার ঘটিকার সময় কুলকুণ্ডলিনী প্রসাদ তাঁহার কক্ষে তারক রাও ও আত্রেয়ীকে ডাকিয়া বলিলেন, "চিরকাল শুষ্কজ্ঞান চর্চ্চা করিয়াছি। এখন সে সমস্তই অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হইতেছে। আজীবন বেদ ও গীতার আলোচনা করিলাম, কিন্তু তার সার ছাড়িয়া খোসা লইয়াই কাল কাটাইলাম। বেদ ও গীতার কাল নির্ণয় করিবার জন্য কতই না, ঐতিহাসিক গবেষণা করিলাম, কিন্তু ঐ সকল মহাগ্রন্থনিহিত ভগবৎতত্ত্বের আলোচনা করিলাম না। এখন আর অনুশোচনা করা বৃথা। তোমরা দুইজনে আমার কাছে বসিয়া হরিনাম কর।"

তারক ও আত্রেয়ী পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ বলিলেন, "বুঝিয়াছি, অনভ্যস্ত কাজ করিতে তোমাদের সঙ্কোচ হইতেছে। এক কাজ কর, ও পাড়ার হরিদাস বাবাজীকে ডাকিয়া আন। আমার নাম করিলেই সে আসিবে।"

আধঘন্টার মধ্যেই হরিদাস বাবাজী আসিলেন। তাঁর সর্ব্বাঙ্গে তিলক। পরিধানে কৌপীন ও বহির্ব্বাস, হাতে হরিনামের ঝুলি। যাহাকে দেখিতেছেন তাহাকেই প্রণাম করিতেছেন, মুখে সর্ব্বদাই "হরেকৃষ্ণ" বুলি। হরিদাস বাবাজীকে দেখিয়া কুলকুণ্ডলিনী প্রসাদ বলিলেন, "বাবাজী, আমার শেষ সময় উপস্থিত। অন্তিম

সময়ে মধুর হরিনাম শোনাও। এখন বুঝিতেছি এতদিন কেবল ভূতের বোঝা বহিয়া মরিয়াছি।"

হরিদাস বাবাজী বলিলেন, "বাবুমহাশয়, ওকথা বলিবেন না। আপনি পুণ্যাত্মা, নহিলে মৃত্যুকালে সাংসারিক বিষয়ের চিন্তা ছাড়িয়া হরিনাম শুনিতে আপনার ইচ্ছা হইল কেন? আপনার প্রতি প্রভুর কৃপা আছে। গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

"যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজেদন্তে কলেবরং।
তংতমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ।"

"বাবুমহাশয় যে এতদিন শ্রীমদ্ভাগবৎ গীতা আলোচনা করিয়াছেন তাহা কখনই নিষ্ফল হইতে পারে না।" এই বলিয়া হরিদাস বাবাজী সুমধুর কণ্ঠে গাহিলেন,—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"

পঞ্জিকাতে কলিযুগের তারকব্রহ্ম নাম মুদ্রিত থাকে, অনেকের ন্যায় তারক রাও ও আত্রেয়ী তাহা দেখিয়াছেন। কিন্তু তাহা যে এত শ্রুতিমধুর, তা শুনিলে যে মনে এত ভাবের উদয় হয়, তাহা তাঁহারা জানিতেন না। তাঁহাদের ইচ্ছা হইতেছিল বাবাজীর সহিত হরিনাম করেন, কিন্তু কেমন সঙ্কোচ বোধ হইতেছিল, মনে হইতেছিল, লোকে কি মনে করিবে। অভ্যাস না থাকিলে ইচ্ছা সত্ত্বেও ভাল কাজ করিতে লোকের হাত উঠে না।

বাবাজীর সহিত কুলকুণ্ডলিনী প্রসাদও ধীরে ধীরে হরিনাম গান করিতে লাগিলেন। আধঘণ্টা পরে তাঁহার স্বর ক্রমশঃই

ক্ষীণ হইতে লাগিল, মৃত্যুর পূর্ব্বলক্ষণ প্রকাশ পাইল। তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া পালঙ্ক হইতে নামাইয়া ঘরের বাহিরে আনা হইল। আত্রেয়ী ইহাতে প্রথমতঃ আপত্তি করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা নিজে ঐরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করাতে তাঁহাকে নিরস্ত হইতে হয়। কুলকুণ্ডলিনী প্রসাদ অতি ক্ষীণকণ্ঠে হরিনাম করিতে করিতে হরিদাস বাবাজীর দিকে আঙ্গুল বাড়াইয়া কি যেন ইসারা করিলেন। বাবাজী তাহা দেখিয়া কুলকুণ্ডলিনী প্রসাদের আরও কাছে গিয়া হরিনামের মালাগাছি তাঁহার কপালে বুকে ঠেকাইয়া বলিলেন, "এইবার সকলে উচ্চৈঃস্বরে হরিধ্বনি কর। শ্রীহরিঃ, শ্রীহরিঃ, শ্রীহরিঃ।" তারক রাও এবং আত্রেয়ীও সকলের সঙ্গে হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন। হরিনাম শুনিতে শুনিতে হরিনাম উচ্চারণ করিতে করিতে বৃদ্ধ কুলকুণ্ডলিনী প্রসাদ সজ্ঞানে প্রাণত্যাগ করিলেন।

তারক রাও স্বভাবতঃ আমোদপ্রিয়। তিনি ভাবিয়াছিলেন আত্রেয়ীকে বিবাহ করিয়া জীবনতরী আমোদের স্রোতে ভাসাইয়া দিবেন। কিন্তু বিবাহের কিছুদিন পরেই বুঝিতে পারিলেন আত্রেয়ীর মতি গতি অন্য রূপ। ভোগমূলা-পাশ্চাত্য বিদ্যায় শিক্ষিতা হইলেও আত্রেয়ী অধিক মাত্রায় কর্ত্তব্যপরায়ণা ছিলেন। বৃদ্ধ পিতার সেবা-শুশ্রূষার জন্য তিনি নিজে অনেক অসুবিধা সহ্য করিতেন। পিতার গ্রন্থ-সম্পাদনে সাহায্য করার

সময় কখন কখন তাঁর মন বিদ্রোহী হইবার উপক্রম করিত, কিন্তু কর্ত্তব্য বুদ্ধির প্রেরণায় মনকে দৃঢ় করিয়া বাহিরে বিরক্তির চিহ্ন-মাত্র প্রকাশ না করিয়া পিতার কার্য্যে লিপ্ত হইতেন। অনবরত বৃদ্ধের সঙ্গে থাকিয়া তিনি কিছু বেশী গম্ভীর রকমের হইয়া পড়িয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর আত্রেয়ীর গাম্ভীর্য্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। তিনি তাঁহার পিতার সঙ্কলিত গ্রন্থ-সম্পাদন কার্য্য শেষ করার জন্য সর্ব্বদাই তারককে তাগাদা করিতেন। তারক রাও প্রথম প্রথম কিছুদিন সে বিষয়ে মৌখিক উৎসাহ দেখাইয়াছিলেন, কিন্তু কার্য্যতঃ বড় একটা কিছু করেন নাই। তারক রাও চান তিনি যতক্ষণ বাড়ীতে থাকেন, আত্রেয়ী তাঁহার কাছে থাকিয়া তাঁর চিত্তবিনোদন করেন, কিন্তু কার্য্যতঃ সে সব কিছুই হয় না বলিলেও চলে। আত্রেয়ী যতটুকু সময় স্বামীর কাছে থাকেন তার অধিকাংশ সময়ই তাঁর মুখে তাঁর পিতার প্রতি তাঁর যে একটা কর্ত্তব্য আছে সে কথাই লাগিয়া থাকে। ইহাতে ব্যাপার এইরূপ দাঁড়াইয়াছে যে, তারক রাও যত কম সময় বাড়ীতে থাকিলে চলে তাহাই করেন। কার্য্যব্যপদেশে অধিকাংশ সময়ই তিনি বাহিরে বাহিরে কাটান। আত্রেয়ীর এক এক সময়ে মনে হয় তিনি বোধ হয় স্বামীকে সুখী করিতে পারিতেছেন না। এক এক সময়ে ভাবেন স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিবেন কি করিলে তিনি সুখী হন, কিন্তু মুখ ফুটিয়া তা জিজ্ঞাসা করিতে কেমন যেন বাধ বাধ ঠেকে।

১১

আত্রেয়ী কলিকাতায় মহিলা-সমিতির এক অধিবেশনে যোগ দিতে গিয়াছেন। তিনি সেই সমিতির একজন সভ্য ছিলেন। তারক রাও সেদিন বাড়ীতে, অর্থাৎ দক্ষিণপাড়ার বাড়ীতে রহিয়াছেন। সেদিন সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া আত্রেয়ী দেখিলেন, লাইব্রেরী-গৃহ পুস্তক শূন্য। বিস্মিত হইয়া তারককে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, তারক লাইব্রেরীর সমস্ত পুস্তক ও পাণ্ডুলিপি কয়েক সহস্র মুদ্রায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নিকট বিক্রয় করিয়াছেন। ইহা শুনিয়া ক্রোধে আত্মহারা হইয়া আত্রেয়ী তারককে যথোচিত তিরস্কার করিলেন।

তারক রাও। আত্রেয়ী, তুমি ক্রোধে আত্মহারা হইয়াছ, সেজন্য কি বলিতেছ বুঝিতেছ না। আমি এখন তোমার সঙ্গে এ সম্বন্ধে আর কোন কথা কহিব না। তুমি বিশ্রাম কর। একটু জলযোগ কর, তোমার মাথা ঠাণ্ডা হউক, তার পর আমি যা করিয়াছি তাহা যে যুক্তিসঙ্গত, তাতে তোমার ক্ষোভের কোন কারণ নাই, তা তোমাকে বুঝাইতে পারিব ভরসা করিতেছি।

আত্রেয়ী। আমার মাথা ঠিক আছে। তুমি আমাকে বৃথা স্তোকবাক্যে ভুলাইতে চাহিতেছ। আমি সাধারণ হিন্দুর ঘরের অশিক্ষিতা মেয়ে নই যে, আমাকে যা বলিবে বিনা বিচারে তাই অভ্রান্ত বলিয়া মানিয়া লইব। বাবা তোমার উপর অগাধ বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন, তুমি যে এত অল্প সময়ের মধ্যে তাঁর সম্বন্ধে

এরূপ বিশ্বাসঘাতকের ন্যায় ব্যবহার করিতে পারিবে আমার এরূপ ধারণাই ছিল না। জীবনে আর কতজনের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছ ?

আত্রেয়ীর মুখে "বিশ্বাসঘাতকতা" শব্দ শুনিয়া তারক রাওয়ের বুক কাঁপিয়া উঠিল, মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করিল। কিন্তু মুহূর্ত্তমধ্যে আত্মসংবরণ করিয়া লইয়া তিনি ধীর কণ্ঠে বলিলেন, "নাঃ, তুমি অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়াছ। তোমার গালি খাইয়া আজ আমার অন্য কোন দ্রব্য আহারের প্রয়োজন হইবে না। তুমি এখন বিশ্রাম কর। আমি এখন একটু না হয় ঘুরিয়া আসি। আমি এখন তোমার চক্ষুঃশূল হইয়া পড়িয়াছি।" এই বলিয়া একগাছি ছড়ি হাতে করিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন।

আত্রেয়ী এতক্ষণ দাঁড়াইয়াছিলেন। তারক ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইবার পর একখানি চেয়ারে বসিয়া দু'হাতে মুখ ঢাকিয়া বিলক্ষণ কাঁদিলেন। প্রায় আধঘণ্টা অতীত হইলে, পুরাতন ঝি নিমায়ের মা বুড়ি, আত্রেয়ীর কাছে আসিয়া বলিল, "আত্তি দিদি, ওঠো, হাত মুখ ধুয়ে একটু জলটল খেয়ে ঠাণ্ডা হও। তারপর জামাইবাবু ফিরে এলে আবার কোমর বেঁধে কোঁদল ক'রো। আমি ভাবতাম কি দিদি, তোমরা ইস্কুলে গিয়ে ইন্‌জিরি শিখেছ, মেমসাহেবের মত স্বোয়ামীর হাত ধ'রে এখান ওখান যেতে শিখেছ, তোমাদের মধ্যে কি, আমাদের মত স্বোয়ামী ইস্তিরিতে ঝগড়াঝাঁটি হয় ? ওমা, একি দেখি ! তোমাদেরও সেই যদি আমাদের মত' ঝগড়াই কত্তে হ'ল দিদি তা হ'লে দেখে শুনে আলাপ ক'রে,

তার পর পছন্দ হ'লে পর বিয়ে করায় আর বেশী কি ফল হ'ল ? স্বোয়ামী ইস্তিরিতে মাঝে মাঝে ঝগড়াঝাঁটি না হ'লে বুঝি মানায় না, কি বল ? তা যাই বল দিদি, জামাইবাবু আমাদের মাটীর মানুষ। তুমি ত উগ্রচণ্ডা হ'য়ে কত কথাই ব'ল্লে, সে বেচারী না রাম না গঙ্গা একটা কথাও কইলে না, চুপ-চাপ সব হজম ক'ল্লে। আমাদের ঘরে ও রকম হ'লে কি হ'ত জান ? আমি দু' চার কথা তেড়ে ফুড়ে বল্লেই প্রথমে আমার বাড়ীর মানুষ আমাকে দু' এক বার ধমক দিয়ে চুপ কত্তে বল্‌তো, তাতেও যদি না চুপ কত্তাম, তা হ'লে চুলের মুঠি না ধ'রে বেশ দু' দশ ঘা বসিয়ে দিত।" নিমায়ের মার আদর্শ দাম্পত্য-জীবনের কাহিনী শুনিয়া এত কষ্টের মধ্যেও আত্রেয়ী না হাসিয়া থাকিতে পারিলেন না। তখন নিমায়ের মাতা এক রকম জোর করিয়া আত্রেয়ীকে ধরিয়া লইয়া গিয়া তাঁর মুখ হাত ধোয়াইয়া, কাপড় বদলাইয়া তাঁকে কিছু খাওয়াইল।

১২

আত্রেয়ীর কাছে তাড়া খাইয়া তারক রাও ষ্টেশনে গেলেন। ষ্টেশন প্ল্যাটফর্ম্মে আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর একখানি কলিকাতাগামী ট্রেণ আসিল। তারক রাও সেই ট্রেণে আরোহণ করিয়া লিলুয়া ষ্টেশনে নামিলেন। লিলুয়া ষ্টেশনের একপোয়া আন্দাজ দূরে একটি নূতন পল্লী কয়েক বৎসর হইল স্থাপিত হইয়াছে। সেই পল্লীর নাম 'নয়াবাজার'। বেহার ও উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের

শ্রমজীবিরাই সেই পল্লীর অধিবাসী। সেই সকল শ্রমজীবিদের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি উচ্চ মূল্যে সরবরাহ করিবার জন্য কয়েকটি মাড়োয়ারী ও বাঙ্গালীর দোকান খোলা হইয়াছে। দু' দশ জন রেলের কেরাণীও এ পল্লীতে বাস করেন। তাঁদের সুবিধা এই যে তাঁরা যে বাড়ীতে বাস করেন, তা রেলের বাড়ী, তাঁহাদের ভাড়া দিতে হয় না এবং স্বল্পবেতনে গৃহকর্ম্ম করিবার চাকর-চাকরাণী পান। এই পল্লীর পূর্ব্বদিকে একটি ক্ষুদ্র জঙ্গল ও পশ্চিম দিকে দিগন্ত বিস্তৃত মুক্তপ্রান্তর।

তারক রাও ট্রেণ হইতে নামিয়া পদব্রজে নয়াবাজারের দিকে অগ্রসর হইলেন। প্রায় পনের মিনিট বাদে একটি একতালা দালান বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া দুয়ারে ধাক্কা দিলেন। একটু পরেই সুখীয়া দুয়ার খুলিলে তারক বাড়ীর মধ্যে ঢুকিলেন। সুখীয়া দুয়ার বন্ধ করিয়া দিল। দুইজনে দক্ষিণ দুয়ারী একটি সুসজ্জিত কক্ষে গিয়া দুইখানি চেয়ারে মুখোমুখী বসিল। সুখীয়া বলিল, "তুমি একটু ব'স, আমি কয়েকটা পান সেজে আনি। হ্যাগা টহলাকা মাতারি! চুণা আনা হয়েছে?" তদুত্তরে এক কদাকার বৃদ্ধা রান্নাঘর হইতে মুখ বাড়াইয়া বলিল, "হাঁ, আনা হয়েছে, এই ঘরে আছে লিয়ে যা, হামি এখন এ ঘর ছেড়ে যেতে পারবে না।" সুখীয়া তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে গিয়া চুণের ভাঁড় লইয়া আসিয়া আর একটি ক্ষুদ্র কক্ষে গিয়া ক্ষিপ্রহস্তে কয়েকটা পান সাজিয়া লইল। সুখীয়া সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিত। তারক রাও তাকে লেখাপড়া শিখাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন,

কিন্তু তাঁর সে চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। সুখীয়া কোন প্রকারেই লেখাপড়া শিখিতে পারিল না। অনেক চেষ্টা করিয়াও তার অক্ষর পরিচয় হইয়া উঠিল না।

সুখীয়াকে তার বিমাতা তাড়াইয়া দেওয়ার পর তারক রাও তাকে কলিকাতা লইয়া যাইতেছিলেন, একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। কিন্তু কলিকাতায় সুখীয়াকে রাখায় অসুবিধা হইতে পারে বিবেচনা করিয়া অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তাহাকে 'নয়াবাজারে' রাখাই সুবিধা মনে করিয়াছেন। এখানে তিন কুঠারী একখানি দালান বাড়ী ভাড়া করা হইয়াছে। বাড়ী ভাড়া মাসে তিন টাকা। টহলাকা মাতারী নাম্নী এক দাসী নিযুক্ত হইয়াছে, তাহার বয়স সাতষট্টি বৎসর। সে কানে কম শুনে। তাকে তারক রাও বেশ ভাল করিয়া বলিয়া দিয়াছেন যে, বাজার করিতে যাওয়া ছাড়া আর কোন সময়ে যেন সে বাড়ীছাড়া অন্য কোনখানে না যায়, আর তারক ছাড়া আর কাহাকেও বাড়ীতে আসিতে না দেয়। সুখীয়াকেও তারক বলিয়া দিয়াছেন যে, টহলাকা মাতারী বাজারে গেলে সুখীয়া যেন বাড়ী বন্ধ করিয়া রাখে। অন্য সময়ও যেন বাড়ী বন্ধ থাকে, কেবল তারক আসিলেই যেন বাহির দরজা খোলা হয়। তা না হইলে তারক ও সুখীয়া উভয়েরই বিপদ্ ঘটিবে। তারক সুখীয়াকে একটি কালীর পট দিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন, "তোমার যদি কখনও ভয় লাগে, তা হ'লে এই ঠাকুরকে জানাইও। ইনি তোমার সকল ভয় দূর করিবেন, তোমাকে ও আমাকে সকল বিপদ্ হইতে রক্ষা করিবেন।" সুখীয়া তারকের সকল কথাই

বিশ্বাস করিত। তারক তাহাকে যে ভাবে চলিতে বলিতেন, সে ঠিক সেই ভাবেই চলিত।

এই বাড়ীতে সুখীয়া আসিবার পর প্রথম প্রথম সপ্তাহে একদিন করিয়া সে তারকের দেখা পাইত। তারক প্রতি রবিবারে অপরাহ্ন তিনটা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সুখীয়ার সঙ্গে গল্প করিয়া কাটাইয়া দক্ষিণপাড়ায় অথবা কলিকাতায় যাইতেন। আত্রেয়ীর সহিত তারকের বিবাহের কথাবার্ত্তা সুস্থির হইলে পর তারক সুখীয়ার জন্য তার স্বজাতীয় উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান করিয়াছিলেন এবং ইঙ্গিতে সে কথা সুখীয়াকে জানাইয়াছিলেন। কিন্তু সুখীয়া এতই সরলা যে ঘোর প্যাঁচের কোন কথা তাহার মাথায় ঢুকিত না। সে বুঝিয়াছিল, তারকের সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছে। সে নিশ্চিন্ত ছিল। তারক ভাবিতেন, "এ বালিকাকে আমি একটু আদর যত্ন করিলেও, একদিন উত্তেজনার বশবর্ত্তী হইয়া তাহার গলায় ফুলের মালা পরাইয়া দিলেও, তাতেই আমাদের উভয়ের বিবাহ হইল বলিলেও নিতান্ত ছেলেমানুষ না হইলে তা সত্য বলিয়া কেহ ধরিয়া লয় না। সুখীয়াকে একদিন আসল কথা ভাঙ্গিয়া বলিব যে, তার সঙ্গে আমার বিবাহ হয় নাই, সে অন্যকে বিবাহ করিতে পারে। আমি তার জন্য উপযুক্ত পাত্রের যোগাড় করিব।" কিন্তু কার্য্যতঃ তারক রাও সুখীয়াকে এ কথা কিছুতেই বুঝাইতে পারিলেন না, সে রকম কোন কথা কিছুতেই সুখীয়ার মাথায় ঢুকিল না। এক এক সময়ে তারক রাও ভাবিতেন, সুখীয়াকে প্রকাশ্যভাবে বিবাহ করিয়া তাহাকে লইয়াই সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ

করিবেন, আত্রেয়ীকে বিবাহ করিবার সঙ্কল্প ত্যাগ করিবেন, আত্রেয়ীকে সকল কথা খুলিয়া বলিয়া তাঁহার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া জন্মের মত তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিবেন। কিন্তু আত্রেয়ীর মত সুশিক্ষিতা উচ্চবংশসম্ভূতা সুন্দরীকে বিবাহ করিলে উচ্চশিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত সমাজে, তারকের ন্যায় বংশ-গৌরবহীন ব্যক্তির, যে সম্মান ও প্রতিপত্তিলাভের সম্ভাবনা আছে, সে লোভ ত্যাগ করাও তারকের ন্যায় ইহলোকসর্ব্বস্ব ব্যক্তির পক্ষে বড় সহজ কথা নয়। তারক আত্রেয়ীর আশা ছাড়িতে পারিলেন না। সুখীয়াকেও ছাড়িতে পারিলেন না। সুখীয়ার প্রতি তাঁর কেমন একটা মমতা জন্মিয়া গিয়াছিল। সুখীয়াকে প্রকৃত ব্যাপার কিছুতেই বুঝাইতে না পারিয়া, উপায়ান্তর না দেখিয়া তারক অবশেষে এক পশ্চিমদেশীয় পুরোহিতের সাহায্যে অতি গোপনে সুখীয়াকে বিবাহ করিলেন।

আত্রেয়ীকে বিবাহ করার পর হইতেই আত্রেয়ীর গাম্ভীর্য্য তারকের অসহ্য বোধ হওয়ায় তিনি ক্রমশঃই সুখীয়ার প্রতি অধিক আকৃষ্ট হইতেছিলেন। খাটিয়া খুটিয়া বাড়ী আসিয়া ভাবিতেন, আত্রেয়ী কাছে বসিয়া তাঁহার চিত্তবিনোদন করিবে, কিসে তাঁহার শ্রান্তির অপনোদন হয় তাহাই করিবে, কিন্তু কার্য্যতঃ দেখিতেন যে, স্বামীর শারীরিক সুখ-স্বচ্ছন্দতার দিকে আত্রেয়ীর ততটা দৃষ্টি নাই। আত্রেয়ী ভাবিতেন, ও সব চাকরবাকরদের কাজ, স্বামীর সহিত যাহাতে মানসিক উন্নতি হয় এই সকল বিষয়ের আলোচনা করিলেই স্বামী সুখী হইবেন।

তারক রাও প্রাণ দিয়া আত্রেয়ীকে ভালবাসিতেন, কিন্তু তিনি তাঁর ভালবাসার যেরূপ প্রতিদান চান তাহা পাইতেন না বলিয়া ক্ষুণ্ণ হইতেন। যাহা উপার্জ্জন করিতেন, তার অর্দ্ধেক আত্রেয়ীর হাতে দিতেন, সিকি এক ব্যাঙ্কে জমা দিতেন, আর সিকি নিজে খরচ করিতেন। এ সময় তিনি মাসিক একহাজার টাকারও অধিক উপার্জ্জন করিতেন। আত্রেয়ীর সঙ্গ যখন ভাল লাগিত না তখন তারক রাও সুখীয়ার কাছে গিয়া তার সরলতাপূর্ণ কথা শুনিয়া, তাঁহার প্রতি একান্ত নির্ভরশীলতা দেখিয়া অত্যন্ত আরাম পাইতেন।

আজ তারক রাও আত্রেয়ীর উপর বেশী রকম বিরক্ত হইয়া আসিয়াছিলেন।

১৩

সুখীয়া তারককে বসাইয়া রাখিয়া কয়েক মিনিট পরেই এক গেলাস ঠাণ্ডা জল, এক বাটা পান এবং একটি ডিসে কয়েকটি মিষ্টান্ন লইয়া হাজির হইয়া সেগুলি তারকের সম্মুখে টেবিলের উপরে রাখিল। তারক বলিলেন, "এ সব আবার কেন?" সুখীয়া বলিল, "আজ তোমার মুখ কেমন শুক্‌নো দেখছি। তুমি হাত মুখ ধুয়ে একটু কিছু খাও। বড় গরম পড়েছে, পা ধোয়ার দরকার হয়ত বল, জল এনে দি।" বলিয়া একঘটি জল আনিয়া তারকের পা হইতে জুতা ও মোজা খুলিয়া গামছা ঘটির জলে ভিজাইয়া ধীরে ধীরে তারকের পা ধুইয়া মুছিয়া দিল। তারক হাতে মুখে জল দিয়া দুইটা সন্দেশ মুখে দিয়া ঠাণ্ডা জল পান করিয়া বড়ই

তৃপ্তি বোধ করিলেন। জলযোগ শেষ হইলে সুখীয়া একবারে চারটা পান তারকের মুখে গুঁজিয়া দিল। তারক পকেট হইতে চুরুট বাহির করিলেন, সুখীয়া দিয়াশালাই জ্বালিয়া চুরুট ধরাইয়া দিল। তারক চেয়ারে হেলান দিয়া চুরুট টানিতে লাগিলেন। সুখীয়া তারকের পাশে চেয়ারের হাতা ধরিয়া দাঁড়াইয়া ধীরে ধীরে তাঁহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল। আরামে তারকের চক্ষু নিমীলিত হইয়া আসিল। দু'জনে কতই না গল্প হইল, গল্প করিতে করিতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল। টহলাকা মাতারী রান্নাঘর হইতে চীৎকার করিয়া বলিল, "এগে মায়ী, চুল্লা ধরেছে, ভাত চাপায়ে দে।" তারক শুনিয়া বলিল, "সুখীয়া, আজ রাত্রে আমি এখানে খাইব, আমার জন্যও ভাত রাঁধিও।" সুখীয়া খুব খুসী হইয়া রাঁধিতে গেল। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে আহার্য্য প্রস্তুত হইল। ভাত, ডাল, মাছের ঝোল, আলুভাতে, একটু অম্বল, আধসের দুধ ইহাই সুখীয়ার আয়োজন। আয়োজন সামান্য, কিন্তু আয়োজনকারিণীর আগ্রহ অত্যন্ত বেশী। কাজেই তারক সুখীয়ার হাতে খাইয়া তৃপ্তিলাভ করিলেন। বলিলেন, "সুখীয়া, আর একদিনের কথা মনে হয়।" সুখীয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "হঁা।" তারক আহারান্তে আচমন করিয়া পূর্ব্বোক্ত চেয়ারে না বসিয়া সেই চেয়ারখানির পাশেই যে পরিষ্কার বিছানা ছিল তাহাতেই হাত পা ছাড়িয়া শুইয়া পড়িয়া পান চিবাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। সুখীয়া তারকের থালা রান্নাঘরে লইয়া গিয়া ভুক্তাবশিষ্ট খাইল। টহলাকা মাতারীর খাওয়া শেষ হইল।

তখন রাত্রি সাড়ে আটটা, তারক তখনও সেই বিছানায় শুইয়া আছেন। টহলাকা মাতারী সুখীয়াকে বলিল, "আগে মায়ী, দেখতো গিয়ে বাবু নিদ্ গিয়েছে কিনা?" সুখীয়া অতি সন্তর্পণে পা টিপিয়া টিপিয়া গিয়া দেখিয়া আসিল তারক ঘুমাইতেছেন। টহলাকা মাতারী সে কথা শুনিয়া বলিল, "বাবুকে জাগাস না যেন।" এই বলিয়া টহলাকা মাতারী রান্নাঘরের সংলগ্ন আর একটি ক্ষুদ্র কক্ষে শুইতে গেল। অন্যান্য দিন সে সুখীয়ার শয়নকক্ষের মেঝেতে মাদুর বিছাইয়া শুইত।

সুখীয়া শয়নকক্ষে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, তারক তখনও ঘুমাইতেছেন। তাঁহার ঘুমের ব্যাঘাত হইতে পারে ভাবিয়া সে কোনরূপ শব্দ না করিয়া চেয়ারখানিতে বসিয়া সুপ্ততারকের পানে মুগ্ধনয়নে চাহিয়া রহিল। কিন্তু চাহিয়া চাহিয়া 'নয়ন না তিরপিত ভেল'। এইরূপে প্রায় একঘণ্টা কাটিল, ষ্টেশনের ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া দশটা বাজিল। সেই সময়ে গড়্ গড়্ শব্দ করিয়া একখানি মালগাড়ী ষ্টেশনে আসিয়া পৌছিল। এই শব্দে তারকের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তারক ঘুমাইবেন বলিয়া ঘুমান নাই। তাঁহার অজ্ঞাতসারে ঘুম আসিয়াছিল। ঘুম ভাঙ্গিবামাত্র তাড়াতাড়ি উঠিয়া ঘড়ি বাহির করিয়া দেখিলেন, দশটা বাজিয়াছে। চেয়ারে সুখীয়া বসিয়া রহিয়াছে দেখিয়া বলিলেন, "তুমি কতক্ষণ বসিয়া আছ! তোমার খুব ঘুম পাইতেছে, না?" সুখীয়া একটু হাসিয়া মুখ নামাইয়া বলিল, "না, না, আমার ঘুম পায় নাই। তুমি ঘুমাও।" তারক অনুচ্চস্বরে যেন নিজের মনেই বলিলেন, "তাই ত, দশটা বাজিয়া গেল, সেই

ভোরে পাঁচটার আগে ত গাড়ী নাই।" সুধীয়া বলিল, "তার জন্য ভাবনা কি, তুমি ঘুমাও না।" তারক "সেই ভাল কথা" বলিয়া শুইয়া সুধীয়াকে তাঁর শিয়রে বসিয়া মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে বলিলেন।

১৪

আত্রেয়ী ভাবিয়াছিলেন, সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পরেই তারক ফিরিবেন, কিন্তু রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত যখন তিনি ফিরিলেন না, তখন একটু চিন্তিত হইলেন। ভাবিলেন, স্বামীর সহিত ওরূপ ব্যবহার না করিলেও চলিত। তিনি লাইব্রেরীর পুস্তকের সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা নিতান্ত মন্দ নাও হইতে পারে। আত্রেয়ী ব্যাপারটার এক দিক্ মাত্র দেখিয়াছেন, সকল দিক্ ভাবিয়া দেখেন নাই। স্বামী যখন চলিয়া গেলেন, তখন তাঁর মুখের ভাব দেখিয়া মনে হইতেছিল যে, তিনি বড় আশায় নিরাশ হইয়া যাইতেছেন, তিনি নিশ্চয়ই কলিকাতায় গিয়াছেন, আজ রাত্রিটা নবীন মজুমদারের সহিত সুখদুঃখের গল্প করিয়াই কাটাইবেন। তিনি ফিরিলে আজকার ব্যবহারের জন্য তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইবে। এইরূপ চিন্তায় রাত্রি দুই প্রহর অতীত হইল, তথাপি তারক আসিলেন না। আত্রেয়ী পুরাতন চাকরকে ডাকিয়া সে কথা জানাইল। সে বেচারী এত রাত্রে ষ্টেশনে গিয়া একটু পরে ফিরিয়া আসিয়া জানাইল যে, ষ্টেশনের লোকেরা জামাইবাবুকে সন্ধ্যার পূর্ব্বে কলিকাতাগামী ট্রেণে উঠিতে দেখিয়াছে। এই সংবাদে আত্রেয়ী কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন। তাঁরও মন বলিতেছিল বটে তিনি কলিকাতাতেই গিয়াছেন।

পরদিবস কলেজের কাজ সারিয়া অপরাহ্ন চারটার সময় তারক দক্ষিণপাড়ার বাড়ীতে আসিলেন। আত্রেয়ী মনে করিয়াছিলেন স্বামী ফিরিয়া আসিলে গত দিনের ব্যবহারের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন, কিন্তু কার্য্যতঃ সেরূপ কোন কথাই তাঁর মুখ দিয়া বাহির হইল না। তবে আত্রেয়ীর মুখ দেখিবামাত্র তারক বুঝিতে পারিলেন, আত্রেয়ী গত রাত্রিটা নিশ্চিন্তমনে কাটাইতে পারেন নাই, স্বামীর জন্য একটু ভাবিয়াছেন মনে করিয়া, তারকের মনে অপূর্ব্ব পুলকের সঞ্চার হইল।

তারক সস্নেহে আত্রেয়ীর হাত ধরিয়া বলিলেন, "কাল রাত্রে না ফিরিয়া তোমাকে কতই না ভাবাইয়াছি, সেজন্য কিছু মনে করিও না। রাত্রি আটটার গাড়ীতে ফিরিব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু মজুমদার মহাশয় কিছুতেই ছাড়িলেন না। কাল পরশু দু'দিন কলেজের ছুটি। এ দুদিন মোটেই বাহির হইব না মনে করিতেছি, তুমি কি বল?" আত্রেয়ী খুসী হইয়া বলিলেন, "তাহা হইলে খুব ভাল হয়।" এত সহজে মনের মেঘ কাটিয়া যাইবে তাহা উভয়ের কেহই ভাবেন নাই। পরবর্ত্তী দুই দিন তারক এক মিনিটের জন্যও বাড়ীর বাহির হইলেন না, আত্রেয়ী সকল সময়ে তাঁর কাছে থাকিয়া সকল বিষয়ে তাঁর মনোরঞ্জন করিতে লাগিলেন। তারক ভাবিলেন, আত্রেয়ীর এই ভাবটা যদি স্থায়ী হয়, তাহা হইলে জীবনটা কি আরামেই না কাটিয়া যায়।

প্রায় তিন বছর একপ্রকার নির্ব্বিবাদে কাটিয়া গেল।

১৩

আজ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কন্‌ভোকেশন। দেশের বহু গণ্যমান্য বিদ্বান্ ব্যক্তি সিনেট গৃহের সম্মুখে উপযুক্ত পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া বিচরণ করিতেছেন। কেহ বা সিনেট গৃহে প্রবেশ করিতেছেন। বড়লাট সাহেবের আসিবার সময় হইয়াছে, তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য সভ্যগণ উৎসুক হইয়া রহিয়াছেন। বড়লাট শুভাগমন করিলেন, ব্যাণ্ড বাজিয়া উঠিল। বড়লাট সাহেব দলবল-সহ সিনেট গৃহে প্রবেশ করিলেন, তার পরে অন্যান্য সভ্যগণ ক্রমশঃ প্রবেশ করিতে লাগিলেন। তারক সিনেট গৃহে প্রবেশ করিতেছেন, এমন সময় কে যেন তাঁর ঘাড়ে হাত দিল। তিনি মুখ ফিরাইয়া দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। সিনেটের বারাণ্ডায় অবস্থিত প্রসন্নকুমার ঠাকুরের প্রস্তরমূর্ত্তির বেষ্টন লৌহবেড়া না ধরিয়া ফেলিলে তিনি নিশ্চয়ই পড়িয়া যাইতেন। যাঁহারা তারককে লক্ষ্য করিলেন তাঁহারা দেখিলেন তিনি ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছেন। তারক রাওয়ের এইরূপ ভাবান্তরের কারণ কি? তারক মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন 'বরদাকান্ত রাও।' স্বয়ং যমকে সম্মুখে দেখিলেও তারক তত ভীত হইতেন না, তারকের মনের ভাব গোপন করিবার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। তাই তাঁহার পশ্চাতে তাঁহার ঘাড়ে হাত দিয়া তাঁহার পালক-পিতা বরদাকান্ত রাওকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া প্রথম দু'এক মুহূর্ত্ত তাঁহার যে বিহ্বলতা দেখা গিয়াছিল, পরমুহূর্ত্তে সে ভাব সংবরণ করিয়া লইয়া তিনি

তাড়াতাড়ি "পাহারাওয়ালা, পাহারাওয়ায়ালা, এহি পাগ্‌লা আদমীকো পাক্‌ড়ো, এহি হামকো খুন করনে মাঙ্গতা।" এই কথা বলিতে বলিতে সিনেট গৃহে প্রবেশ করিলেন। মলিনবেশধারী বরদাকান্ত রাওয়ের চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। তিনিও তারক রাওয়ের পশ্চাতে সিনেট গৃহে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইতেছেন দেখিয়া একজন পাহারাওয়ালা তাঁহাকে নিবারণ করিল। তিনি তাহার নাকে এমন জোরে ঘুসি মারিলেন যে, তার নাক দিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। তা দেখিয়া আরও দুইজন কনেষ্টবল তাঁহার কোমর জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহাকে টানিয়া সেখান হইতে সরাইয়া লইয়া গেল। অতঃপর কন্‌ভোকেসনের কার্য্য যথাবিধি নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইল। কার্য্যান্তে বাহিরে আসিয়া তারককে অধ্যাপক সন্তোষবাবু বলিলেন, "আপনি এত ভীরু প্রকৃতির লোক তা আমার ধারণা ছিল না। ও লোকটা যখন আপনার ঘাড়ে হাত দিল তখন তাহাকে দেখিয়া আপনি এমনই ভয় পাইলেন যে, তা দেখিয়া আমার হাসি পাইতেছিল। ব্যাপার কি? এত ভয় কেন?" তারক রাও মনের ভাব গোপন করিয়া বলিলেন, "বলেন কি, লোকটা যে খুনে, তা কি তার চাউনি দেখিয়া বুঝিতে পারেন নাই। আমি উহাকে দেখিবামাত্র বুঝিতে পারিয়াছি যে, ও পাগল হইয়াছে ও ওর মাথায় খুন চাপিয়াছে।" সন্তোষবাবু বলিলেন, "কি জানি মহাশয়, আমি সেরূপ কিছু বুঝিতে পারি নাই।" তারক রাও জিজ্ঞাসা করিলেন, "লোকটা গেল কোথায় জানেন?" এমন সময় নবীন মজুমদার সেখানে আসিয়া বলিলেন, "কোন্‌

লোকটা, যে একজন পাহারাওয়ালাকে ঘুসি মারিয়া তার রক্তপাত করিয়াছে, সেই লোকটা নাকি ?"

সন্তোষবাবু। "হাঁ, তা'কে পুলিশে ধরিয়া লইয়া গিয়া হাজতে পুরিয়াছে। আমার বোধ হয় পুলিশে লোকটার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবে। তখন আমাদের মধ্যে কয়েকজনকে বোধ হয় সাক্ষী মানিবে। রাও মহাশয় ত প্রধান সাক্ষী হইবেন।" সেদিন আর কোন কথা হইল না। সকলে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। তারক রাও দক্ষিণপাড়ায় ফিরিয়া গেলেন।

আত্রেয়ী তারকের মুখে কন্‌ভোকেশনের বিবরণ শুনিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াছিলেন। তারক তাঁহার বিশ্রামকক্ষে উপস্থিত হইবামাত্র আত্রেয়ী সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, তারকের চোখ দুটি বসিয়া গিয়াছে, মুখ শুকাইয়া গিয়াছে, তিনি কেমন অন্য-মনস্ক ভাবে পোষাক পরিবর্ত্তন করিতেছেন। তাঁহার এই ভাব দেখিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া তাঁহার কাছে গিয়া সস্নেহে তাঁহার কপোলে হাত দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কি শরীর ভাল নাই? এমন দেখিতেছি কেন ?" তারক বলিলেন, "আমি কেমন অস্বচ্ছন্দতা বোধ করিতেছি, দম বন্ধ হইয়া যাইবে মনে হইতেছে। আমি একটু শুইতে চাই।" আত্রেয়ী সযত্নে তারককে বিছানায় শুয়াইয়া দিয়া তাঁহার পাশে বসিয়া তাঁহাকে বাতাস করিতে লাগিলেন এবং তাঁর গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "একজন ডাক্তার ডাকিয়া পাঠাই।" তারক ক্ষীণ কণ্ঠে বলিলেন, "ডাক্তারের প্রয়োজন নাই। তুমি আমাকে এক গেলাস ঠাণ্ডা জল দাও।"

আত্রেয়ী জল দিলে তারক তাহা পান করিয়া বলিলেন, "আত্রেয়ী, আমার মাথায় বাতাস কর। তোমার কষ্ট হইতেছে, ঝি না হয় চাকরকে পাঠাইয়া দাও।" আত্রেয়ী বলিলেন, "তুমি ব্যস্ত হইও না। আমি তোমাকে বাতাস করিতেছি। আমার কোন কষ্ট হইতেছে না। তুমি ঘুমাইবার চেষ্টা কর।" তারক চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। ইতিপূর্ব্বে আত্রেয়ীকে এত আপনার বলিয়া মনে হয় নাই।

আধঘণ্টা পর তারক সুস্থ বোধ করিয়া কিছু খাইতে চাহিলেন। অন্যান্য দিন হইলে আত্রেয়ী ঝি চাকরকে খাবার আনিবার ফরমাইস করিতেন, আজ নিজে গিয়া খাবার লইয়া আসিয়া কাছে বসিয়া তারককে খাওয়াইলেন। খাইয়া তারকের বেশ স্ফূর্ত্তি হইল। তখন তিনি বারাণ্ডায় বসিয়া আত্রেয়ীর সঙ্গে কন্‌ভোকেশনের গল্প করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। খানিকক্ষণ গল্প করার পর তারক ঘুমাইয়াছেন বুঝিতে পরিয়া আত্রেয়ী ঘুমাইলেন। প্রকৃতপক্ষে তারক ঘুমান নাই, ঘুমাইবার ভাণ করিয়াছিলেন। আত্রেয়ী ঘুমাইয়াছেন জানিয়া মনে মনে দিনের ঘটনার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। বরদাকান্তের বিরুদ্ধে পুলিশকোর্টে যে মোকদ্দমা হইবে তাহাতে তারককে সাক্ষ্য দিতে হইলে তিনি কি যে বলিবেন মনে মনে তা ঠিক করিয়া রাত্রি প্রায় বারটার সময় নিদ্রিত হইলেন।

১৬

বরদাকান্ত রাও হাজতে রহিয়াছেন। কনেষ্টবলকে মারিয়া জখম করার অভিযোগে তিনি অভিযুক্ত। লালবাজার পুলিশ-কোর্টে তাঁর বিচার হইবে। কেহই তাঁহার জামিন না হওয়ায় তাঁহাকে হাজতে বাস করিতে হইতেছে।

শত্রুর চক্রান্তে মৌলমিনের পাগলা গারদে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পর বরদাকান্ত রাও অনেক চেষ্টা করিয়াও নিজেকে প্রকৃতিস্থ প্রমাণ করিতে পারিলেন না। তিনি যাহা বলিতেন তাহাই সকলে উন্মত্তের প্রলাপ বলিয়া ধরিয়া লইত। এইরূপ কয়েক বৎসর পাগল না হইয়াও পাগলা গারদে বাস করিতে করিতে শারীরিক ও মানসিক কষ্টে তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটিল। তিনি সময়ে সময়ে বেশ ভাল থাকিতেন, সময় সময় সব ভুলিয়া যাইতেন। তাঁর উন্মত্ততার লক্ষণ এই প্রকাশ পাইয়াছিল যে, উন্মত্তাবস্থায় তাঁর অতীত কালের কোন কথাই মনে পড়িত না। সে অবস্থা কাটিয়া গেলে আবার সকল কথাই সুস্পষ্ট ভাবে মনে পড়িত। এইরূপ উন্মত্তাবস্থায় তিনি একদিন পাগলা গারদ হইতে কেমন করিয়া পলায়ন করিয়া সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া কিছু দূর ভাসিয়া যান, সেই সময়ে কলিকাতাগামী কোন এক জাহাজের লোকেরা তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া দয়াপরবশ হইয়া তাঁহাকে উঠাইয়া কলিকাতা আনয়ন করে। কলিকাতায় আসিয়া তিনি তাঁহার পূর্ব্ব স্মৃতি ফিরিয়া পান। রেঙ্গুনে অবস্থান করার পূর্ব্বে তিনি কয়েক বৎসর

কলিকাতায় বাস করিয়াছিলেন, কলিকাতার অন্ধিসন্ধি তাঁহার জানা ছিল। খবরের কাগজে কন্‌ভোকেশনের সংবাদ পাইয়া কৌতূহলী হইয়া তিনি সিনেট গৃহের নিকটে উপস্থিত হন। সেই সময়ে তাঁহার মনে এরূপ ক্ষীণ আশাও জন্মিয়াছিল যে, এস্থানে তারকের সাক্ষাৎকার লাভ হইলেও হইতে পারে। তার পর যা ঘটিয়াছিল তা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তারককে সিনেট গৃহের বারাণ্ডায় দেখিয়া তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া তাঁহার সহিত কথা কহিবার জন্য বরদাকান্ত অনেক কষ্টে সিনেট গৃহের বারাণ্ডায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তারক সিনেট গৃহে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। তখন তিনি তারকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য তাড়াতাড়ি তারকের ঘাড়ে হাত দিলেন। তারক মুখ ফিরাইয়া দেখিয়া যখন তাঁহার পালক-পিতাকে দেখিয়া কোনরূপ সম্ভাষণ না করিয়া তাঁহাকে পাগল বলিয়া ধরাইয়া দিবার জন্য পাহারাওয়ালাকে ডাকিলেন তখন ঘৃণায় ও ক্রোধে বরদাকান্ত আত্মহারা হইয়া তারককে ধরিবার চেষ্টা করিলেন। পাহারাওয়ালা কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়া তাঁহার ক্রোধের মাত্রা এতদূর বৃদ্ধি পাইল যে, তিনি পাহারাওয়ালাকে ঘুসি মারিয়া তাকে জখম করিলেন। সে সময় তাঁর পূর্ব্ব স্মৃতি পুনর্ব্বার লুপ্ত হইল। তিনি ঘোর উন্মাদ হইলেন।

হাজতে অবস্থান কালে তিন দিন উন্মত্ততার আক্রমণ প্রবল রহিল। চতুর্থ দিন হইতে ক্রমশঃ প্রকৃতিস্থ হইলেন। তখন একে একে সকল কথা মনে পড়িল। তিনি জানিতে পারিলেন,

পনের দিবস পরে তাঁর অপরাধের বিচার হইবে। হাজতে বসিয়া তিনি সকল কথা ধীরভাবে মনে করিয়া লইলেন। ভাবিলেন যে, তারক বোধ হয় তাঁহাকে চিনিতে পারে নাই। সে তাহার পিতাকে চিনিতে পারিলে কখনই ওরূপ ব্যবহার করিত না। সে সময় তিনি যদি তারকের সঙ্গে কথা কহিতেন, তাহা হইলে সকল গোল মিটিয়া যাইত। কোন রকমে কয়েদ হইতে বাহির হইতে পারিলে হয়, এবার মাথা ঠিক রাখিবেন। কখন বা তাঁর মনে হইল, তারক যদি তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াও, তাঁহার হাত এড়াইবার জন্য, আসল কথা চাপিয়া গিয়া, ইচ্ছা করিয়াই তাঁহাকে পাগল বলিয়া ধরাইয়া দিয়া থাকে, তাহা হইলে কি হইবে? তাহা হইলে তার মত অকৃতজ্ঞ নরাধমকে তার ফলভোগ করিতে হইবে। সে সহজে নিষ্কৃতি পাইবে না।

বরদাকান্তের বিচারের দিন আসিল। তিনি যথাসময়ে পুলিশ-প্রহরীবেষ্টিত হইয়া পুলিশকোর্টে চলিলেন। কনেষ্টবল দুর্জ্জন সিং হলফ করিয়া বলিল, "আসামী একজন ভদ্রলোককে আক্রমণ করিতে যাইতেছিল দেখিয়া সেই ভদ্রলোকের কথামত আমি আসামীকে বাধা দিই। তাহাতেই আসামী রুখিয়া আমার মুখে এক ঘুসি মারে, তাহাতে আমার নাক ও ঠোঁট কাটিয়া রক্ত পড়ে। এই দেখুন হুজুর, এখনও দাগ রহিয়াছে। তারপর বলবন্ত সিং আসামীকে ধরিয়া ফেলে।"

পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীকে বলিলেন, "তুমি এই সাক্ষীকে জেরা করিতে চাও?" আসামী "হাঁ", "না" কিছুই বলিল না।

তখন তারক রাওকে ডাকা হইল। তিনি হলফ করিয়া বলিলেন, "আমার নাম তারক রাও। আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন শাস্ত্রের প্রোফেসার। কন্‌ভোকেশনের দিন আমি সিনেট হলে প্রবেশ করিতে যাইতেছি, এমন সময়ে আসামী আমার ঘাড়ে হাত দিল। আমি ভয়ে চীৎকার করিয়া সিনেট হলে ঢুকিয়া পড়িলাম। কনেষ্টবল দুর্জ্জন সিং উহাকে ধরিলে, আসামী দুর্জ্জন সিংকে জোরে ঘুসি মারিয়া দুর্জ্জন সিংহের নাক ভাঙ্গিয়া দিল। আমি ঘরের মধ্য হইতে ইহা দেখিয়াছি।" যতক্ষণ তারক জবানবন্দী দিতেছিলেন, বরদাকান্ত বিস্ফারিত নেত্রে তারকের দিকে এক দৃষ্টিতে চাহিয়াছিলেন। তারকের বক্তব্য শেষ হইলে হাকিম আসামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এই সাক্ষীকে জেরা করিতে ইচ্ছা কর?"

বরদাকান্ত বলিলেন, "হাঁ।"

হাকিম। আচ্ছা, তোমার যা জিজ্ঞাস্য থাকে, জিজ্ঞাসা কর।

বরদাকান্ত। আচ্ছা তারক রাও বল দেখি, তোমার পিতার নাম কি?

তারক রাও। বরদাকান্ত রাও।

বরদাকান্ত। আচ্ছা বল দেখি, আমি সেই বরদাকান্ত রাও কিনা?

তারক অবিচলিত কণ্ঠে বলিলেন, "তুমি বদ্ধ পাগল। তুমি বরদাকান্ত রাও নও।"

আসামীর জেরার ভঙ্গী দেখিয়া অনেকেই হাসিয়া উঠিল।

কোর্ট ইন্সপেক্টার বলিলেন, "হুজুর, আসামী জেরায় কতকগুলা অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছে। আসামী বরদাকান্তই হউন আর সারদাপ্রসাদই হউন, উনি যদি দুর্জ্জন সিং কনেষ্টবলকে মারিয়া থাকেন, উঁহার শাস্তি হইবে। ধান ভানিতে মহীপালের গীত কেন ?"

বরদাকান্ত। আলবৎ দরকার আছে ; তুমি চুপ কর। এই তারক রাও, বল তুমি আমার জহরৎগুলি কোথায় রাখিয়াছ ?

তারক রাও। (আদালতের প্রতি) হুজুর, আসামী পাগল।

বরদাকান্ত চীৎকার করিয়া বলিলেন, "আমি পাগল, না তুই চোর। পাজি,—দাঁড়া ত তোর মজা দেখাই।" এই বলিয়া তারক রাওকে মারিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। কনেষ্টবল তিন চার জনে মিলিয়া তাঁহাকে নিবারণ করিল। হাকিম কিয়ৎক্ষণ আসামীর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, "তুমি কি বলিতে চাও, আস্তে আস্তে বল দেখি।" বরদা রাও বলিলেন, "আমি বলিতে চাই যে, এই ব্যক্তি এই তারক রাও, ও আমার কতকগুলি রত্ন চুরি করিয়াছে।"

হাকিম। কোথায় চুরি করিল ?

বরদা রাও। "কোথায় ? তাই ত ? আঁ ! একি হইল ! একি হইল ! সব যে অন্ধকার হইয়া গেল।" এই বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বসিয়া পড়িলেন।

হাকিম তারক রাওকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এ লোকটিকে ইতিপূর্ব্বে চিনিতেন কি ?"

তারক রাও। আর চেনাচিনি কি ? দেখিতেছেন ত লোকটা ঘোর উন্মাদ।

হাকিম। তাহাই ত দেখিতেছি। ডাক্তার দিয়া পরীক্ষা করাইতে হইবে যে, এ ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে পাগল কিনা। ডাক্তারের রিপোর্টের পর মোকদ্দমার রায় হইবে। আপনি এখন যাইতে পারেন।

তারক রাও হাকিমকে অভিবাদন করিয়া চলিয়া আসিলেন। বাহিরে আসিয়া মনে মনে বলিলেন, "যাক্, বাঁচা গেল। এত সহজে নিষ্কৃতি পাইব ভাবি নাই। বুড়া সত্য সত্যই পাগল হইয়াছে। আর আমাকে পায় কে ?"

তারক নিশ্চিন্তমনে কলেজে গেলেন।

বরদা রাওকে ডাক্তারেরা কয়েকদিন পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "আসামীতে পাগলের কোন লক্ষণ দেখা গেল না।" অগত্যা হাকিম বরদা রাওকে পাঁচদিনের জন্য বিনা পরিশ্রমে কারাবাসের আদেশ দিলেন। বরদা রাও কারাগারে চলিলেন। তখন তাঁহার মাথা বেশ পরিষ্কার হইয়াছে। কারাগারে বসিয়া তিনি আগাগোড়া সব কথা মনে মনে আলোচনা করিয়া লইলেন। দেখিলেন, সব কথাই বেশ মনে আছে। কিন্তু মনের এই অবস্থা যে কতদিন স্থায়ী হইবে তাহা বলা সুকঠিন। তাঁহার মনে হইল, "তারকটা কি পাষণ্ড, কি অকৃতজ্ঞ। আমি তাহাকে পুত্রাধিক স্নেহে পালন করিলাম, সুশিক্ষিত করিলাম, আর সে কিনা আমার রত্নগুলি আত্মসাৎ করিয়া আমাকে অস্বীকার করিয়া বসিল। নিজের সুখে মত্ত থাকিয়া আমার একবার অনুসন্ধানও করিল

না। অনুসন্ধান করা ত দূরের কথা, দেখা হইলে বলিয়া বসিল, আমি একটা বদ্ধ পাগল। আমাকে সে চিনে না? এমন নরাধমের ভার ধরণী বহন করিতেছেন কেমন করিয়া? তারকের মত অকৃতজ্ঞ নরাধমকে তার পাপের উপযুক্ত শাস্তি দিতে হইবে। কে শাস্তি দিবে? আমি দিব। শৈশবে সে যখন অন্নাভাবে মারা যাইতেছিল, আমি তাহাকে বাঁচাইয়াছি। দুধ দিয়া কালসাপ পুষিয়াছি, জলসেচন করিয়া বিষবৃক্ষকে বৰ্দ্ধিত করিয়াছি। আমি নিজেই সে বিষবৃক্ষের মূলে কুঠারাঘাত করিব। পাষণ্ড যেমন আমাকে ঠকাইয়াছে, বাঁচিয়া থাকিলে আরও কতজনকে ঠকাইবে, কতজনের সর্ব্বনাশ করিবে। উঃ, কি ভয়ঙ্কর প্রকৃতির লোক! কি সয়তান! কি আশ্চর্য্য, এমন সুন্দর তার মুখখানি, যেন সরলতার আধার। শৈশবে তার দেবশিশুতুল্য মুখখানি দেখিয়াই আমি মুগ্ধ হইয়া তাহাকে নিজের কাছে রাখিয়া পুত্রবৎ স্নেহে পালন করি। এখনও মুখখানি তার তেমনি রহিয়াছে। অমন সরলতা-পূর্ণ যার মুখখানি, তার হৃদয়ে এত কুটিলতা থাকিতে পারে, তা' ত কখন কল্পনাও করি নাই। ভগবানের রাজ্যে তা হইতেও পারে, তা না হইলে সুগন্ধি-কুসুমের অভ্যন্তরে সর্প থাকিবে কেন? এইবার খালাস পাইলে হয়, যেমন করিয়া পারি হতভাগাকে জাহান্নমে পাঠাইব। শুধু তাহার দোষ দিলেই বা চলিবে কেন। এ আমারই কর্ম্মফল। আমি তাহাকে যেরূপ শিক্ষা দিয়াছি তাহাতেই সে এরূপ স্বার্থপর হইয়াছে। ঈশ্বর, পরকাল, পরার্থপরতা, এ সকল বিষয়ে আমি তাহাকে

কখনও ভাবিতে শিক্ষা দিই নাই। সে নিজের সুখের কথাই ভাবিতেছে, আমার কথা ভাবিবে কেন। আমি আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব। নীরবে সকল কষ্টভোগ করিব। মুটেগিরি করিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করিব, তবু তার কথা ভাবিব না। নাঃ, তাহা ঠিক হইবে না। তাহাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে হইবে, তাহাকে প্রাণে মারিব না ; লোক-সমাজে অপদস্থ করিতে হইবে, তাহা হইলেই তার উপযুক্ত শাস্তি হইবে। একবার জেল হইতে বাহির হইতে পারিলে হয়, তার গতি-বিধির উপর গোপনে সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিব। মাথাটা ঠিক রাখিতে হইবে, হঠাৎ রাগিয়া উঠিলেই সব কেমন ভুল হইয়া যায়। এবার তার সম্মুখে পড়িলেও রাগ করিব না ; স্থির থাকিব।" এইরূপে কারাগারে বসিয়া বরদাকান্ত কত কথাই না ভাবিলেন। ভাবিয়া ভাবিয়া কিছু স্থির করিতে পারিলেন না। দু'দিন মাথা বেশ পরিষ্কার থাকে, আবার দু'দিন সব গোলমাল হইয়া যায়।

পাঁচদিনের পর কারাগার হইতে মুক্তি পাইয়া, তিনি বড়বাজারে গিয়া মুটেগিরি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁর বয়ঃক্রম ষাইটের অধিক হইলেও তিনি তখন বেশ সবল ও কার্য্যক্ষম ছিলেন।

১৭

শনিবার। তারক রাও আজ একটার সময় ছুটি পাইয়াছেন। তিনি স্থির করিয়াছেন আজ সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সুধীরার কাছে কাটাইয়া সন্ধ্যার ট্রেণে দক্ষিণপাড়ায় যাইবেন। বেলা দুইটার সময় লিলুয়া ষ্টেশনে নামিতেছেন, এমন সময় সভয়ে দেখিলেন,

বরদাকান্ত রাওয়ের ন্যায় এক ব্যক্তি যেন তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ী হইতে নামিলেন। কিন্তু তার একটু পরেই তিনি যে কোথায় গেলেন তার ঠিক করিতে পারিলেন না। একবার আশঙ্কা হইল, বুঝি তিনি তারকের পিছনে লাগিয়াছেন। আর একবার ভাবিলেন, তা না হইতেও পারে। তিনি এখানে ঘুটেগিরির সন্ধানে আসিয়াছেন। বেশীক্ষণ সে বিষয় চিন্তা না করিয়া নয়াবাজারের দিকে অগ্রসর হইলেন।

সেইদিন সন্ধ্যার সময় তারক রাও লিলুয়া ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম্মে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, শীঘ্রই ট্রেণ আসিবে। ট্রেণ আসিল। তারক রাও একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় প্রবেশ করিতে যাইতেছেন, এমন সময় সেই কামরার দরজায় তাঁর ডান হাতের অতি নিকটে সজোরে একখানি ফর্ম্মাইট আসিয়া পড়িল। তারক তাড়াতাড়ি কামরার মধ্যে প্রবেশ করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া শার্সির ভিতর দিয়া চাহিয়া দেখিলেন যে, এক ব্যক্তি দৌড়িয়া পলাইতেছে ; মনে হইল, সে ব্যক্তি বরদাকান্ত রাও। ট্রেণ ছাড়িয়া দিল। তারকের মনে ভয়ানক ভয় হইল। তিনি বুঝিতে পারিলেন, বরদাকান্ত রাও তাঁহাকে হত্যা করিবার সঙ্কল্প করিয়াছে, তাঁহার গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছে। তিনি স্থির করিলেন, এখন হইতে পারত-পক্ষে তিনি সন্ধ্যার পর কোন স্থানেই যাতায়াত করিবেন না, সুধীয়াকে কলিকাতায় রাখিবেন; আবশ্যক হইলে দক্ষিণপাড়ার বাস উঠাইবেন, সর্ব্বদা সাবধানে থাকিবেন, সকল দিকে নজর রাখিয়া পথ চলিবেন।

সেই দিন হইতে তারকের মনের সকল শান্তি নষ্ট হইল। তাঁর দৃষ্টি কেমন ভীতি-ব্যঞ্জক হইল। আত্রেয়ী স্বামীর এই পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিলেন। প্রথম প্রথম কয়েকদিন কিছু বলিলেন না, ভাবিলেন, তাঁর বুঝিবার ভ্রম হইয়াছে। কিন্তু যখন দেখিলেন, স্বামীর ভয়চকিত দৃষ্টি, সর্ব্বদা অন্যমনস্কতা দূর হইল না, তখন তিনি তারককে তাঁর ভাবান্তরের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তারক সহজে কোন আমল দিলেন না, কিন্তু আত্রেয়ী যখন খুব পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিলেন, তখন বলিলেন, "একটা পাগল আমার পিছনে লাগিয়াছে, সে আমাকে হত্যা করিবার ফিকিরে ঘুরিতেছে।" শুনিয়া আত্রেয়ী শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন, "কেন? কে সে লোকটা?" তারক রাও বলিলেন, "তা কেমন করিয়া বলিব। পাগলামীর খেয়ালে আমাকে মারিতে চায়। এমন হইতে পারে যে, তার কোন শত্রুর চেহারার সহিত আমার চেহারার সাদৃশ্য দেখিয়া আমাকে তার শত্রু ঠাওরাইয়া আমার পিছনে লাগিয়াছে। এটা অবশ্য আমার অনুমান মাত্র। পাগল যে কখন কি খেয়ালে চলে, তা সকল সময় বুঝিতে পারা যায় না।"

আত্রেয়ী। তুমি ইহার কি প্রতীকার করিতেছ?

তারক। প্রতীকার আর কি করিব, সাবধানে চলা ফিরা করি, পুলিশে খবর দিয়া রাখিয়াছি।

১৮

অধ্যাপক মরিশন এদেশের কাজ হইতে অবসর লইয়া বিলাত যাইতেছেন। তিনি চরিত্রগুণে ও অধ্যাপনা নৈপুণ্যে তাঁহার সহকর্ম্মী ও ছাত্রদিগের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন; সেইজন্য তাঁহার বিদায় উপলক্ষে তাহাকে অভিনন্দিত করিবার জন্য সার্কুলার রোডের এক বিস্তৃত বাগান বাড়ীতে অধ্যাপক ও ছাত্রদের একটি সান্ধ্যসম্মিলনের আয়োজন হইয়াছিল। সম্মিলন শেষ হইতে অনেক রাত্রি হইবে এই ভয়ে তারক রাও প্রথমতঃ সেই সম্মিলনে যোগ দিতে অনিচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু তাঁহার বন্ধুবান্ধবেরা কিছুতেই ছাড়িলেন না, তিনিও আমোদ প্রমোদের লোভ ছাড়িতে পারিলেন না; ভাবিলেন, সম্মিলনের কার্য্য শেষ হইলে ঘোড়গাড়ী বা মোটর করিয়া কলিকাতার বাসায় ফিরিবেন। কলিকাতাতেই বাকী রাত্রিটুকু কাটাইবেন, তাহা হইলে কোন বিপদের সম্ভাবনা থাকিবে না।

সম্মিলন স্থানে নিমন্ত্রিতগণ সমবেত হইয়াছেন। গান, বাজনা, গল্পগুজব চলিতেছে। রাত্রি আটটা বাজিল। অনিয়ন্ত্রিত গান, বাজনা, গল্পগুজব থামিল। এইবার অধ্যাপক মরিশনের বিদায় অভিনন্দন পঠিত হইবে। সকলে নির্দ্দিষ্ট আসনে স্থির হইয়া বসিলেন। প্রথমে একটি গীত হইল। তারপর তারক রাও অভিনন্দন পাঠ করিতে উঠিলেন। এমন সময় তারক রাওয়ের দশ হাত দূরে কে চীৎকার করিয়া বলিল, "মহাশয়গণ, আপনারা যাকে ভাল লোক মনে করিতেছেন সে চোর, সে চোর। সে বিশ্বাস-

ঘাতক।" স্বর শুনিয়া তারকের আত্মাপুরুষ শুকাইয়া গেল। স্বর বরদাকান্ত রাওয়ের। তিনি কেমন করিয়া এখানে আসিলেন? ঐ চীৎকার শুনিয়া আর সকলে চীৎকারকারীর দিকে ধাবিত হইলেন। সহজেই চীৎকারকারীকে ধরিয়া ফেলিলেন। দেখা গেল, চীৎকারকারী নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের মধ্যে কেহই নহে, তাহাদের সম্পর্কিত কেহই নহে। অনেকেই চীৎকারকারী বৃদ্ধকে জোর করিয়া সে স্থান হইতে বাহির করিয়া দিতে উদ্যত হইলেন। চীৎকারকারী কিছুতেই যাইতে চায় না, সে বলিল, "আমি চোর ধরিতে আসিয়াছি।" নবীন মজুমদার এই সম্মিলনের একজন প্রধান উদ্‌যোগকারী ছিলেন। তিনি একটি আলো লইয়া চীৎকারকারীর মুখের নিকট আনিয়া তার মুখখানি ভাল করিয়া দেখিয়া বলিলেন, "এ লোকটাকে ত সেই লোক বলিয়া বোধ হইতেছে, যে একবার সিনেট হলের বারাণ্ডায় একজন কনেষ্টবলকে জখম করিয়াছিল।" তখন কেহ কেহ "পুলিশ" "পুলিশ।" বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিল। কয়েকজন কনেষ্টবল হাজির হইল। চীৎকারকারীকে পুলিশের হস্তে সমর্পণ করা হইল। পুলিশ বৃদ্ধ বরদাকান্তকে টানিয়া লইয়া চলিল। বরদাকান্ত যাইতে যাইতে বলিলেন, "মহাশয়গণ আমি যাইতেছি। কিন্তু আমার কথা আপনারা শুনুন। আপনারা চোর ও বিশ্বাসঘাতককে চিনিয়া রাখুন। আপনাদের মধ্যে একজন চোর ও বিশ্বাসঘাতক রহিয়াছে।" অধ্যাপক মরিশন বলিলেন, "লোকটা কি বলে একবার শোনাই যাক্ না কেন?" একজন বলিলেন, "ও

একটা পাগল, ওর কথা আর কি শুনিব?" কিন্তু অনেকেরই কৌতূহলের মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ায় কনেষ্টবলকে অপেক্ষা করিতে বলা হইল। সে বরদাকান্ত রাওকে ধরিয়া দাঁড়াইল। নবীন মজুমদার জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওহে বাপু, তুমি কি বলিতেছিলে? আমাদের মধ্যে কে চোর ও বিশ্বাসঘাতক?" বরদাকান্ত রাও তারক রাওকে দেখাইয়া বলিলেন, "এই তারক রাও চোর। সে আমার বহুমূল্যের রত্নগুলি চুরি করিয়া আত্মসাৎ করিয়াছে। আমি তার পালক-পিতা, আমার সহিত সম্বন্ধ অস্বীকার করিতেছে, এমন বিশ্বাসঘাতক, এমন অকৃতজ্ঞ?" বরদাকান্ত রাও কথাগুলি এমন ভাবে বলিলেন যে, তাহা শুনিয়া অনেকেরই মনে কেমন সন্দেহ হইল। একজন তারক রাওকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁ, মহাশয়, এ লোকটা আপনার সম্বন্ধে এ সব কথা বলে কেন? আপনি কি লোকটিকে চেনেন?" তারক দেখিলেন, সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইয়াছে। বরদাকান্ত রাওয়ের মাথা এখন ঠিক আছে, এইবার সব প্রকাশ করিয়া দিবে, তারকের লাঞ্ছনার সীমা থাকিবে না। ভিতরে ভয় হইলেও বাহিরে সাহস দেখাইয়া একটা অসম সাহসের কাজ করিলেন। বলিলেন, "এ লোকটাকে চিনি। অমারা যখন রেঙ্গুনে ছিলাম, ও সে সময় আমাদের বাজার সরকার ছিল। অত্যধিক গাঁজা ও মদ খাইয়া উহার মাথা খারাপ হইয়া যায়। তাহা দেখিয়া আমার বাবা উহাকে তাড়াইয়া দেন। সে অবধি ওর মাথায় খেয়াল ঢুকিয়াছে যে, ও আমার বাবা বরদাকান্ত রাও আর আমি ওর কতকগুলা রত্ন আত্মসাৎ

করিয়াছি।" সন্তোষবাবু বলিলেন, "কৈ আপনি পুলিশ কোর্টে যে এজাহার দেন তাহাতে ত এ সকল কথা কিছু বলেন নাই ?"

তারক রাও। বলার দরকার ছিল না বলিয়া বলি নাই।

বরদাকান্ত। তারক মিথ্যাবাদী। আমি সত্যই বরদাকান্ত রাও।

তারক রাও। তুমি বরদাকান্ত রাও, বটে! বরদাকান্ত রাও সংস্কৃত, বাঙ্গলা, ইংরেজী, ফরাসী ও ফার্সি এই পাঁচটি ভাষা জানিতেন। তুমি তা জান ?

বরদাকান্ত। হাঁ জানি।

তারক রাও। "জান নাকি ? আচ্ছা, এই ইংরেজী খবরের কাগজে কি লেখা আছে বল দেখি ?" এই বলিয়া তারক বরদা রাওয়ের সম্মুখে সেদিনকার একখানি ইংরেজী দৈনিক ফেলিয়া দিলেন।

বরদাকান্ত রাও কাগজখানি তুলিয়া লইয়া সেখানি পড়িবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তার এক বর্ণও বুঝিতে পারিলেন না। তাঁর পূর্ব্বস্মৃতি সম্পূর্ণরূপে লোপ পাইল। তিনি হতাশ ভাবে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িয়া বলিলেন, "যাঃ, সব ঘুলাইয়া গেল।"

তারক দুঃসাহসে ভর করিয়া বরদাকান্তের সম্মুখে ইংরাজী দৈনিক ফেলিয়া দিয়া তাঁর ইংরেজী বিদ্যার পরিচয় লইতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, এতটা যে হইবে, বরদাকান্ত যে ইংরেজীর এক বর্ণও পড়িতে পারিবেন না, তা স্বপ্নেও ভাবেন নাই। আন্দাজে যে তীর নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহা লক্ষ্যবিদ্ধ করিয়াছে দেখিয়া আশ্বস্ত

হইলেন। পুলিশের লোকেরা বরদা রাওকে টানিয়া লইয়া চলিয়া গেল। আরও ঘণ্টা দুই পর সভা ভঙ্গ হইল।

অনধিকারে অপরের জায়গায় প্রবেশ করিয়া বিরক্তি উৎপাদন করার অপরাধে বরদা রাওয়ের তিন দিন সশ্রম কারাবাসের এবং পনের টাকা জরিমানার আদেশ হইল। জরিমানার টাকা দিতে না পারিলে আরও দুই দিন শ্রীঘরে বাস করিতে হইবে। জরিমানার টাকা যে আসামীর দেওয়ার উপায় নাই, ম্যাজিষ্ট্রেট তাহা জানিতেন। তথাপি উক্তরূপ হুকুম দেওয়ার উদ্দেশ্য যে কি তাহা তিনিই বলিতে পারেন। অ-হাকিমদের তা বলিবার সাধ্য নাই।

১৯

অধ্যাপক মরিশনের বিদায়-অভিনন্দন ঘটিত ব্যাপারের বিস্তৃত বিবরণ ইংরেজী ও বাংলা কাগজে বাহির হইয়াছে। আত্রেয়ী তাহা দেখিয়া একদিন রাত্রে তারক রাওকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "লোকটা তোমার পিছনে লাগিয়াছে কেন? বলিতে পার লোকটা কে? পাগলই বা হইল কেন?"

তারক রাও। আমাদের সান্ধ্য-সম্মিলনের যে রিপোর্ট বাহির হইয়াছে, তাহাতেই সব কথা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পড়িয়াছ বোধ হয়।

আত্রেয়ী। "পড়িয়াছি বলিয়াই ত জিজ্ঞাসা করিতেছি। তুমি ইতিপূর্ব্বে যে পাগলের কথা বলিয়াছিলে এ ব্যক্তি কি সেই?"

তারক। হাঁ।

আত্রেয়ী। কিন্তু আমার মনে হইতেছে যে তখন তুমি এমন কথা বল নাই যে, এ লোকটা পূর্ব্বে তোমাদের চাকর ছিল, আর ওর পাগ্‌লামীর একটা লক্ষণ এই যে, ও মনে করে যে সে তোমার পিতা।

তারক। তখন কি বলিয়াছি না বলিয়াছি তা আমার ঠিক মনে নাই। যদি না বলিয়া থাকি, তাহা হইলে এমন হইতে পারে যে ও কথা বলা আবশ্যক বলিয়া মনে হয় নাই।

আত্রেয়ী। তুমি আমাকে তোমার সকল কথা বল না। স্ত্রীর নিকট স্বামীর কোন কথা গোপন থাকা উচিত নয়।

তারক। এ তোমার অন্যায় অভিমান আত্রেয়ী। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কোন কথা গোপন থাকা কর্ত্তব্য নয়, এ কথা ঠিক, কিন্তু তাই বলিয়া স্বামীর মনঃকষ্টের কারণ উপস্থিত হইলেই বিবেচনা না করিয়া তা স্ত্রীর নিকট প্রকাশ না করিলে ভাগবত অশুদ্ধ হইয়া যাইবে, আমি এমন মনে করি না। স্বামী যদি মনে করে, আমি কষ্ট ভোগ করিতেছি, আমিই করি, স্ত্রীকে তা জানাইয়া বৃথা কষ্ট কেন দিই, তাহা হইলে স্বামীকে দোষ দেওয়া যায় না।

আত্রেয়ী। স্ত্রীকে কষ্টের অংশ দিলে কষ্টের লাঘব হয়। স্ত্রী স্বামীর সুখ ও দুঃখ উভয়েরই সমান অংশভাগিনী।

তারক। এখন হইতে আমি তোমার কাছে আমার কোন কথাই গোপন করিব না।

আত্রেয়ী। এক কাজ করিলে হয় না?

তারক। কি!

আত্রেয়ী। এক বছরের ছুটি লইয়া ভারতবর্ষের নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়ান যাক, তাহা হইলে বুড়াটা আর তোমার পিছনে লাগিতে পারিবে না। কিছুদিন ধরিয়া তোমাকে কাছে ভিতে না দেখিতে পাইলে তোমার কথা ভুলিয়াও যাইতে পারে।

এ প্রস্তাব তারক রাওয়ের নিকট নিতান্ত মন্দ ঠেকিল না, কিন্তু অত দীর্ঘ সময়ের জন্য সুখীয়ার কি বন্দোবস্ত করিবেন, তাহাকে কাহার কাছে রাখিয়া যাইবেন স্থির করিতে না পারিয়া মনের প্রকৃত ভাব গোপন করিয়া বলিলেন, "বেশ উপায় ঠাওরাইয়াছ। এক বৎসরের ছুটির জন্য কালই দরখাস্ত করিব। কিন্তু এখন ছুটি পাইব কি না সন্দেহ।"

আত্রেয়ী। কেন তুমি ত অনেক দিন ছুটি লও নাই।

তারক। সে কথা ঠিক। কিন্তু আজকাল উপযুক্ত অধ্যাপকের বড় অভাব, কয়েকজন সাহেব প্রোফেসর ছুটি লইয়া বিলাত গিয়াছেন।

আত্রেয়ী। চেষ্টা করিয়া ত দেখ।

তারক। "তা আর বলিতে।" বলিয়া আত্রেয়ীর কপোলে একটি স্নেহপূর্ণ চুম্বন মুদ্রিত করিয়া দিয়া ছড়ি হাতে করিয়া ভ্রমণ করিতে বাহির হইয়া গেলেন।

২০

দুই দিবস পরে আত্রেয়ী তারককে ছুটির কি হইল জিজ্ঞাসা করায় তারক বলিলেন, "কর্ত্তাদের জানাইয়াছি। ছুটি পাইব কি না এখনও ঠিক বলিতে পারিতেছি না।" প্রকৃত পক্ষে তারক ছুটির জন্য মোটেই চেষ্টা করিতেছিলেন না। পাঁচ দিন পরে তারককে বেশ স্ফূর্ত্তির সহিত বাড়ী আসিতে দেখিয়া আত্রেয়ী ভাবিলেন, বুঝি আজ ছুটি পাইয়াছেন, তাই অত স্ফূর্ত্তি। কিন্তু জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, ছুটি পাইবার সম্ভাবনা নাই। আত্রেয়ী বুঝিতে পারিলেন না ছুটি না পাওয়ায় তারকের আজ এত স্ফূর্ত্তি কেন হইল। ভাবিলেন, স্ফূর্ত্তির অন্য কারণ থাকিতে পারে। উহার মনে পাগলাটা সম্বন্ধে যে দুশ্চিন্তা আছে, তাহা এই রকম করিয়া দূর হইলেই মঙ্গল। এই সকল ভাবিয়া তারককে সে সম্বন্ধে আর কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না।

তারকের স্ফূর্ত্তির কারণ ছিল। কয়েক দিবস পূর্ব্বে তারক হ্যারিসন রোডে কৃষ্টদাস পালের প্রস্তরমূর্ত্তির নিকট দাঁড়াইয়া ধর্ম্মতলাগামী ট্রামের অপেক্ষা করিতেছিলেন, এমন সময়ে অতি নিকটে বিকট আর্ত্তনাদ শুনিয়া চাহিয়া দেখিলেন, এক ব্যক্তির বাঁ হাতের উপর দিয়া একটি মোটর গাড়ী চলিয়া গিয়াছে। লোকটি মূর্চ্ছিত হইয়া রাস্তায় পড়িয়া গিয়াছে। সহানুভূতিপূর্ণ হৃদয়ে তারক আহত ব্যক্তির নিকট গিয়া চমকিত হইলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহার মন আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল। পর মুহূর্ত্তেই

সে ভাব গোপন করিয়া লইয়া মুখে বিমর্ষতার ভাব আনিয়া সমবেত দর্শকদের সহিত আহত ব্যক্তির জন্য সমবেদনা প্রকাশ করিয়া মোটর-চালকের হঠকারিতার নিন্দা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পুলিশ ডাকিয়া আহত ব্যক্তিকে মেডিক্যাল কলেজের হাসপাতালে লইয়া যাইবার বন্দোবস্ত করিলেন। তাঁর একজন ছাত্র সেই সময় হাসপাতালের অন্যতম সহকারী ডাক্তার ছিলেন বলিয়া তাঁহার নামে একখানি চিঠি লিখিয়া দিয়া আহত ব্যক্তির চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত করিতে বলিলেন। তাঁর মন বলিল, "এ বুড়ো যেরূপ আহত হইয়াছে, বোধ হয় দু'তিন দিনের মধ্যেই মারা যাইবে। তাহা হইলে আর আমাকে পায় কে?"

এ বুড়া কে? এ বুড়া বরদাকান্ত রাও। তারককে লক্ষ্য করিয়া তাঁহার কিছু দূরে থাকিয়া চলিতে চলিতে হঠাৎ পা পিছলাইয়া পড়িয়া যান, সেই সময় তাঁর বাঁ হাতের উপর দিয়া মোটর গাড়ী চলিয়া যায়। মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্ত্তি হইলে পর মধ্যে মধ্যে তারক রাও তাঁহাকে দেখিতে যাইতেন। হাসপাতালের ডাক্তার, শুশ্রূষাকারী ও ভৃত্যদের নিকট বৃদ্ধের জন্য যে তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন এইরূপ ভাব প্রকাশ করিতেন। বৃদ্ধের অবস্থা কিন্তু আশাজনক বোধ হইতেছিল না। চতুর্থ দিবসে ডাক্তার বলিলেন, "বৃদ্ধের প্রবল জ্বর হইয়া বিকার উপস্থিত হইয়াছে। বিকারের ঘোরে সে ভয়ানক অস্থিরতা প্রকাশ করিতেছে।" তারক পঞ্চম দিবসে বৃদ্ধের অনুসন্ধান লইতে গিয়া শুনিতে পাইলেন বৃদ্ধ মারা গিয়াছে, দেখিলেন, বৃদ্ধ যে খাটে শুইত

সে খাট শূন্য। মৃতদেহ দাহ করিবার জন্য নিমতলার ঘাটে কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। এই সংবাদে তারকের মন আশ্বস্ত হইল। তিনি ভাবিলেন, "বাবাঃ, এতদিনে নিশ্চিন্ত হইলাম। আর সর্ব্বদা প্রাণ হাতে করিয়াও বেড়াইতে হইবে না, প্রাণের দায়ে মিথ্যার জালও বুনিতে হইবে না।" সেই দিনই তারক স্ফূর্ত্তির সহিত বাড়ী গিয়া আত্রেয়ীকে ছুটি পাওয়া গেল না জানাইয়াছিলেন এবং আত্রেয়ী তারকের স্ফূর্ত্তি দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন।

কয়েক মাস নিরুপদ্রবে কাটিয়া গেল।

২১

আশ্বিন মাস। শারদীয় উৎসব আগত প্রায়। বাংলা দেশে ব্যস্ততার সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। প্রবাসী বাড়ী গিয়া প্রিয়জনকে দেখিবার সুখ কল্পনায় অনুভব করিতেছে। স্কুল কলেজের ছেলেরা কেমন করিয়া অবকাশকাল কাটাইবে তাহাই ভাবিতেছে আর দিন গুণিতেছে। ব্যবসাদারেরা কাজের ভিড়ে আহার নিদ্রার সময় পাইতেছে না। সপ্তমী পূজার তিন দিন বাকি আছে। চতুর্থীর অপরাহ্নে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইল, সামান্য বাতাস বহিল। বাতাসের বেগ ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। পঞ্চমীর দিন বেলা এক প্রহরের পূর্ব্বে ঝড় ও বৃষ্টির বেগ এতদূরই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল যে, লোকের ঘর হইতে বাহির হইবার সাধ্য রহিল না। সপ্তমীর প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত প্রকৃতির এই তাণ্ডব নৃত্য চলিল। এই কয়দিনে

বাংলার বহু জেলার লোকের সর্ব্বনাশ হইল। কাহারও ঘর বাড়ী নষ্ট হইল, কত লোক ঘর চাপা পড়িল, কত লোক বাণের জলে ভাসিয়া গেল। দেশে হাহাকার পড়িল।

বিপন্নদিগকে সাহায্য করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু দেশের অর্থশালী ব্যক্তিগণ বিপন্নদিগকে সাহায্য করিতে অগ্রসর না হইলে গভর্ণমেণ্টের সাহায্যে অতি অল্পসংখ্যক লোকের কষ্টের অবসান হইবে বুঝিতে পারিয়া কয়েকজন পরদুঃখকাতর উৎসাহশীল কর্ম্মী এই কার্য্যে ব্রতী হইলেন। ইঁহাদের মধ্যে রামকৃষ্ণমিশনের লোকেরাই সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। রামকৃষ্ণ-মিশনের লোকদের অক্লান্ত চেষ্টায় অনেকে এই বিপন্নদের সাহায্যার্থে অগ্রসর হইলেন। কেহ বা অর্থ সাহায্য করিলেন, কেহ বা বহু অসুবিধা ও কষ্ট স্বীকার করিয়াও দুঃস্থদিগের নিকটে গিয়া তাহাদের দুঃখমোচনে প্রবৃত্ত হইলেন। বহু শিক্ষিতা ও সম্ভ্রান্ত মহিলা দুঃস্থ নারী ও শিশুদিগের সাহায্যার্থে একটি সমিতি গঠিত করিলেন। আত্রেয়ী সেই সমিতিতে উৎসাহের সহিত যোগ দিলেন। হাওড়া হইতে বালি ষ্টেশনের পার্শ্বস্থ কতকগুলি স্থান আত্রেয়ী ও আর কয়েকজন উচ্চশিক্ষিতা মহিলার কর্ম্মক্ষেত্র হইল। তারক আত্রেয়ীর হস্তে প্রচুর অর্থ দিতেন, সেই অর্থ আত্রেয়ী আপন ইচ্ছামত খরচ করিতে পারিতেন। আত্রেয়ী যখন এইরূপ বিপন্নের সাহায্য করা কার্য্যে ব্যাপৃত, সেই সময়ে সরকারী কার্য্য উপলক্ষে দুই সপ্তাহের জন্য তারককে দার্জ্জিলিং যাইতে হইল।

তারক পাঁচ দিন হইল দার্জ্জিলিং গিয়াছেন। আত্রেয়ী এবং

তাঁহার সহকর্ম্মিণী দুইজন মহিলা কয়েকজন পরিচারিকা ও দুইজন মহিলা চিকিৎসককে সঙ্গে লইয়া লিলুয়া ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী স্থানগুলি পরিদর্শন করিতে আসিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে তাঁহারা কয়েকদিন এস্থানে আসিয়াছিলেন।

অপরাহ্ণ। আত্রেয়ী নয়াবাজার পল্লীর একটি বাড়ীতে রুগ্ন ব্যক্তিদিগের ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া ফিরিতেছেন, তাঁর সঙ্গে একজন পরিচারিকা রহিয়াছে। আত্রেয়ী পদব্রজে আসিতেছেন। নয়াবাজার হইতে একটি নাতিপ্রশস্ত পাকা রাস্তা সদর রাস্তার সহিত মিলিত হইয়াছে। এই সদর রাস্তা ধরিয়া লিলুয়া ষ্টেশনে যাওয়া যায়। আত্রেয়ী নয়াবাজারের রাস্তা দিয়া আসিতেছেন।

এই রাস্তা যেস্থানে সদর রাস্তার সহিত মিলিত হইয়াছে সেইখানে আসিয়া দেখিলেন যে, তিন চার বছরের একটি হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ শিশু,—বালক বলিয়াই বোধ হইল, সদর রাস্তার উপর একাকী দাঁড়াইয়া ভীত-দৃষ্টিতে এদিক ওদিক চাহিতেছে। এই শিশুর গায়ে একটি ছিটের জামা, তাতে হাঁটু পর্য্যন্ত ঢাকা। এই ছেলেটিকে দেখিয়া আত্রেয়ী থমকিয়া দাঁড়াইলেন, ছেলেটির মুখ তাঁর নিকট অত্যন্ত পরিচিত বোধ হইল। কিন্তু তিনি যে ছেলেটিকে কোথায় দেখিয়াছেন তাহা মনে করিতে পারিলেন না। ছেলেটি আত্রেয়ীকে দেখিয়া তাঁহার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। ছেলেটিকে দেখিতে আত্রেয়ীর বড় ভাল লাগিল। তিনি সস্নেহে ছেলেটির মুখে চুমা খাইয়া তাহাকে কোলে উঠাইয়া লইয়া বলিলেন, "খোকা, তোমাদের বাড়ী কোন্‌টা ?" খোকা আত্রেয়ীর

কোল হইতে তাড়াতাড়ি নামিয়া পড়িয়া আত্রেয়ীর আঁচল ধরিয়া তাঁহাকে নয়াবাজারের দিকে টানিতে লাগিল। আত্রেয়ীর কেমন কৌতূহল বোধ হইল। তিনি শিশুর সঙ্গে সঙ্গে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। বৃসি দশ বার আসিয়া বালক একবার দাঁড়াইল। আত্রেয়ীও সেই সঙ্গে দাঁড়াইলেন। শিশু আত্রেয়ীর দিকে মুখ ফিরাইয়া চাহিয়া দৌড়িয়া রাস্তার অতি নিকটবর্ত্তী একটি একতলা দালান বাড়ীর সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। সেই বাড়ীর দরজা ভিতর হইতে বন্ধ। আত্রেয়ী ভাবিলেন, এই বাড়ীটাতেই বোধ হয় ছেলেটি থাকে। তিনি তাড়াতাড়ি ছেলেটির কাছে গিয়া দুয়ার ঠেলিলেন, দেখিলেন, দুয়ার ভিতর হইতে বন্ধ। দু'একবার একটু জোরে ধাক্কা দিলেন। তথাপি দুয়ার খুলিল না, অথবা কেহ যে দুয়ার খুলিতে আসিতেছে তাহা বুঝিতে পারা গেল না। তখন আত্রেয়ী অপেক্ষাকৃত উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "ওগো, এ বাড়ীতে কে আছ, বেরিয়ে এসো, তোমাদের খোকা কোথায় চ'লে গিয়েছিল, ফিরে এসেছে, শীঘ্র দুয়ার খোল।" এমন সময় এক পরমাসুন্দরী যুবতী তাড়াতাড়ি আসিয়া দুয়ার খুলিয়া দিয়া আত্রেয়ীকে দেখিয়া যেন কেমন থতমত খাইয়া গেল। ছেলেটী "মা, মা" বলিয়া যুবতীর কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া মুহূর্ত্তমধ্যে তার মার কোল হইতে নামিয়া পড়িয়া আত্রেয়ীর কাছে গিয়া তাঁহার আঁচল ধরিয়া টানিতে লাগিল। এমন সময় ছেলের মায়ের ঘটে একটু বুদ্ধি যোগাইল। সে বলিল, "খোকা ভারী দুষ্টু। কখন বাড়ীর বাইরে চ'লে গিয়েছিল, আমরা জানতেও পারি নাই। ভাগ্যি আপনি দেখে-

ছিলেন, নৈলে না জানি কি বিপদ্ হ'ত! তা, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? ভিতরে এসে একটু বসবেন আসুন, এখানে এখন আর কেউ নাই।" আত্রেয়ী দ্বিরুক্তি না করিয়া যুবতীর সহিত বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। যুবতী দুয়ার ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া দিয়া আত্রেয়ীকে লইয়া গিয়া একটি সুসজ্জিত কক্ষে বসাইল। এই কক্ষের আসবাব খুব বেশী ও বহুমূল্যের না হইলেও বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সুরুচির পরিচায়ক। আত্রেয়ীকে টেবিলের সম্মুখস্থ একখানি চেয়ারে বসাইয়া যুবতী সানবাঁধা মেঝেতে বসিল। আত্রেয়ী একটু ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "মেঝেতে ব'সলেন কেন? ওই তক্তপোষে বসুন না?" যুবতী হাসিয়া বলিল, "আমাকে আপনি বলছেন কেন? আমাকে এ পর্য্যন্ত কেউ 'আপনি' বলে নি। আপনি ত আমার চেয়ে বয়সে বড় ব'লে বোধ হচ্চে। আপনি আমার দিদি হ'লেন। কেমন, আমার দিদি হ'লেন ত? ওরে খোকা, এই দ্যাখ্, ইনি তোর মাসী।" খোকা অমনি "মাসী, মাসী" বলিয়া আত্রেয়ীর কোল দখল করিল। আত্রেয়ীর মন্দ লাগিল না। ছেলেটিকে কোলে করিয়া, তার মুখের দিকে চাহিয়া, তার কোঁকড়ান চুল নাড়িতে নাড়িতে আত্রেয়ী ভাবিলেন, তাই ত, এ ছেলেটির মুখ আমার কাছে এত পরিচিত বোধ হচ্চে কেন? কোথায় আমি একে দেখলাম? কৈ, ইতিপূর্ব্বে একে কখন দেখেছি ব'লে ত মনে হয় না! আত্রেয়ীকে অন্যমনস্ক দেখিয়া যুবতী বলিল, "ভাবছেন কি? খোকার মাসী হ'তে আপনার আপত্তি আছে নাকি?" আত্রেয়ী যুবতীর সরলতায় মুগ্ধ হইয়া

বলিলেন, "না, না, আপত্তি থাকবে কেন? তোমাকে দেখে বড় সুখী হ'য়েছি। তোমার নাম কি ভাই?"

যুবতী বলিল, "আমার নাম সুধীরা।"

আত্রেয়ী। খোকার নাম কি?

সুধীরা। খোকার পোষাকী নাম হচ্চে সরোজাক্ষ, আর আটপৌরে নাম হচ্চে হাবলা।

আত্রেয়ী খোকার গাল টিপিয়া দিয়া বলিলেন, "খোকার নাম সরোজাক্ষ, বড় সুন্দর নাম ত?"

সুধীরা। "ওকে সরোজাক্ষ ব'লে ডাকলে কিন্তু বুঝতে পারে না। হাবার মত তাকায়।" এমন সময়ে পাশের ঘর হইতে শিশুর কান্নার শব্দ আসিল। তাহা শুনিয়া সুধীরা "ও মা, খোকার ঘুম ভেঙ্গেছে" বলিয়া ছুটিয়া পাশের ঘরে গিয়া কিয়ৎক্ষণ পরেই একটি প্রস্ফুটিত পদ্মের মত ফুটফুটে ছয় মাসের ছেলে কোলে করিয়া আত্রেয়ীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। আত্রেয়ী তখন সরোজাক্ষকে বলিলেন, "খোকাবাবু, তুমি একবার কোল হতে নাম ত, একবার খোকনসোনাকে কোলে করি।" সরোজাক্ষ প্রথমে নিজের অধিকৃত রাজ্য ছাড়িতে চাহিল না, অনেক বুঝাইয়া তাহাকে নামান হইল। তখন আত্রেয়ী খোকাকে কোলে করিয়া অনেকক্ষণ আদর করিলেন। ইতিপূর্ব্বে ছোট ছেলে লইয়া তিনি এরূপ আদর বড় একটা করেন নাই।

কথায় কথায় সুধীরা আত্রেয়ীকে জানাইল যে, সুধীরার স্বামী প্রায় প্রতি শনিবারে এ বাড়ীতে আসেন, অন্যান্য দিনে কাজের

ভিড়ে আসিতে পারেন না। কয়েকদিন ধরিয়া মোটেই আসিতে পারেন নাই, বোধ হয় আরও দশ বার দিন আসিতে পারিবেন না।

আত্রেয়ী। কেন? কোথায় গিয়াছেন?

সুখীয়া। কোন্ পাহাড়ে, কি কাজে।

আত্রেয়ী। কোন্ পাহাড়ে?

সুখীয়া। কে জানে দার্জ্জিলিং না কি পাহাড় আছে, সেইখানে।

আত্রেয়ী কেমন উন্মনা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার স্বামী কি কাজ করেন?"

সুখীয়া। গুরুগিরি।

আত্রেয়ী। তোমার স্বামীর নাম কি?

সুখীয়া হা হা করিয়া হাসিয়া বলিল, "নাম কেমন ক'রে ব'লব? স্বামীর নাম কি করতে আছে?"

আত্রেয়ী একটু গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "ওঃ, তাই বুঝি? আচ্ছা মুখে না বল, কাগজে লিখে দেখাও।"

সুখীয়া বলিল, "এখানে ও পাট নাই।"

আত্রেয়ী বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "সে কি রকম?"

সুখীয়া। রকম আর কি? আমি লেখাপড়া জানি না।

আত্রেয়ী বলিলেন, "বল কি? তোমার বাড়ীর মানুষটি গুরুগিরি করেন, আর তুমি লেখাপড়া জান না? বাইরের লোককে এত লেখাপড়া শেখাতে পারেন, আর ঘরের লোকটির বেলায় যত আলিস্যি!"

সুখীয়া। তাঁর দোষ নাই। তিনি চেষ্টা ক'রে ক'রে হার মেনেছেন। আমার মাথায় ওসব কিছুতেই ঢুকল না, তা কি ক'রব বলুন।

আত্রেয়ীর সঙ্গে যে পরিচারিকা ছিল, সে সেই ঘরের বারাণ্ডায় বসিয়াছিল। সে বলিল, "মা ঠাক্‌রুণ, এইবার চলুন। সন্ধ্যো হ'তে আর দেরী নাই।" তাহা শুনিয়া আত্রেয়ী উঠিয়া ছেলে দুটির গালে চুমা খাইয়া সুখীয়াকে বলিলেন, "আজ তবে আসি ভাই। আবার যখন এদিকে আসব, তোমার সঙ্গে দেখা কর্‌ব"। সুখীয়া বলিল, "ভুলবেন না যেন।" আত্রেয়ী "না, না ভুলব কেন? ভুলব কেন?" বলিতে বলিতে ঘর হইতে বাহির হইলেন। সুখীয়া বাহির দুয়ার পর্য্যন্ত সঙ্গে আসিয়া আত্রেয়ীকে বিদায় দিল। আত্রেয়ী চলিয়া গেলে দুয়ার বন্ধ করিয়া পূর্ব্বোক্ত সজ্জিত কক্ষে গিয়া বসিল।

এমন সময় টহ্‌লাকা মাতারী আসিয়া দন্তহীন ব্যক্তির ন্যায় উচ্চারণে বলিল, "আগে মাম্নি, বাবু তোকে যে কথা ব'লে দিয়েছেন, তা কি তোর মনে নাই? তুই দুয়ার খুলে বাইরের লোক এ বাড়ীর মধ্যে আনলি কেন? বাবু শুন্‌লে যে রাগ কর্‌বে?" সুখীয়া বলিল, "রাগ কর্‌বে? দরজা না খুল্লে হাব্‌লা বাড়ীর ভিতরে আসতো কেমন ক'রে? ও কেমন ক'রে বাড়ীর বার হ'য়ে গেল? ও ত নিজে দরজা খুলতে পারে না? তুই বাজার থেকে এসে দরজা বন্ধ কর্‌তে ভুলে গিয়েছিলি, তাই হাব্‌লা পালিয়ে গিয়েছিল। ভাগ্যে এই ভদ্রলোকের মেয়েটি খোকাকে দেখেছিলেন, নৈলে কি হ'ত বল্‌ ত? আসুন বাবু আমি তাঁকে ব'লে দেব। তুই ভারী

অসাবধান।" একথা শুনিয়া টহলাকা মাতারী একটু ভীত হইল। সে অল্প কাজ করিয়া বেশী মাহিনা পাইত। এমন সুখের চাকরী এই বৃদ্ধবয়সে ছাড়িতে তার একটুকুও ইচ্ছা ছিল না। তাই সে সুখীয়ার সঙ্গে আপোষ করিল। স্থির হইল, সুখীয়া যা করিয়াছে তা টহলাকা মাতারী বাবুকে বলিবে না, টহলাকা মাতারীও যে অসাবধানে দুয়ার খুলিয়া রাখিয়াছিল, সে কথা সুখীয়া কাহাকেও বলিবে না।

২২

আত্রেয়ী দক্ষিণপাড়ায় ফিরিয়া আসিলেন। সুখীয়ার বড় ছেলে হাব্লার মুখ কিছুতেই ভুলিতে পারিলেন না। হাব্লার মুখ অত পরিচিত বোধ হইল কেন? ইতিপূর্ব্বে ত আর কখনও হাব্লাকে দেখেন নাই; তথাপি এমন মনে হইল কেন? এক একবার ভাবিলেন, দূর হোক ছাই, ও বিষয় আর ভাবিব না, কিন্তু ইচ্ছা-সত্ত্বেও সে চিন্তা মন হইতে তাড়াইতে পারিলেন না। রাত্রি বারটা পর্য্যন্ত ঘুম আসিল না। শেষ রাত্রে ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিলেন, নয়াবাজারের সুখীয়ার সেই কক্ষ। সুখীয়া বিছানায় বসিয়া আছে, তাহার কোলে তার ছয়মাসের ছেলেটি। বিছানার ধারে টেবিলের পাশে চেয়ারখানির উপরে বসিয়া সরোজাক্ষকে কোলে করিয়া ও কে? আত্রেয়ীর সর্ব্বাঙ্গ যেন হিম হইয়া গেল, সরোজাক্ষকে কোলে করিয়া বসিয়া রহিয়াছে তারক। আত্রেয়ীর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি জাগিয়া বুঝিতে পারিলেন, তাঁর সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছে। কোন রকমে আলো জ্বালিয়া বুঝিতে পারিলেন,

স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। স্বপ্ন হউক, আত্রেয়ীর মন খারাপ হইয়া গেল। এইবার তাঁর মনে হইল যে, সুথীয়ার ছেলে সরোজাক্ষের মুখাকৃতির সহিত তারকের মুখাকৃতির আশ্চর্য্য সাদৃশ্য রহিয়াছে। তবে কি সরোজাক্ষ তারকের পুত্র? সুথীয়া কি তারকের—আত্রেয়ী আর ভাবিতে পারিলেন না। বালিশে মুখ গুঁজিয়া খানিকক্ষণ নিশ্চেষ্টভাবে বিছানায় পড়িয়া রহিলেন। আধঘণ্টার মধ্যেই রাত্রি প্রভাত হইল। সেদিন আত্রেয়ীর কোন কাজেই মন বসিল না। শয়নকক্ষে তারকের একটি তৈলচিত্র ছিল। কিয়ৎক্ষণ সেই চিত্রের দিকে চাহিয়া রহিলেন। একবার ভাবিলেন, আমি অনর্থক সন্দেহ করিতেছি। নিঃসম্পর্কিত লোকদের মধ্যেও আকৃতিগত আশ্চর্য্য সাদৃশ্য কখন কখন দেখা যায়। জাল প্রতাপচাঁদের কথা ত পড়া গিয়াছে। অন্য দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। কেবলমাত্র মুখাকৃতির সাদৃশ্য দেখিয়া কাহাকেও সন্দেহ করা অত্যন্ত অন্যায়। না, আমার সন্দেহের কোন কারণ নাই। আমি যাহা সন্দেহ করিতেছি, তাহা হইতেই পারে না। এ সম্বন্ধে আর একটু সন্ধান লইতে হইতেছে। সুথীয়া কি এমন হইবে? তাহাকে ত পবিত্রতা ও সরলতার আধার বলিয়া বোধ হইল। সে যদি প্রতারিত হইয়া থাকে? আমার মত সেও যদি প্রতারিত হইয়া থাকে? সত্য কি জানিতেই হইবে। এরূপ অন্যায় আমি কিছুতেই সহ্য করিব না। কেন সে আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করিবে? আর যদি বুঝিতে পারি আমার সন্দেহ অলীক, তাহা হইলে স্বামীর প্রতি অন্যায় সন্দেহ করিয়াছিলাম বলিয়া আমি তাঁর

কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়া তাঁকে সকল কথা খুলিয়া বলিব। স্বামীস্ত্রীর পরস্পরের মধ্যে কাহার নিকট কাহারও কোন কথা গোপন থাকা উচিত নয়, তাহা হইলে আর তাহাদের মধ্যে ভালবাসা রহিল কৈ ? আমি আজ বৈকালবেলায় আর একবার সুধীয়ার কাছে যাইব। ওদিকে আজ আমাদের সাহায্যসমিতির কাজও আছে। এইরূপ স্থির করিয়া কোন রকমে খাওয়া দাওয়া শেষ করিয়া বেলা দুইটার সময় আত্রেয়ী একজন পরিচারিকাকে সঙ্গে করিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। যথাসময়ে লিলুয়া ষ্টেশনে পৌঁছিয়া তাঁহার সহকর্ম্মিণীদের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করিতে যাত্রা করিলেন। আত্রেয়ী নয়াবাজারের দিকে গেলেন। বেলা চারিটার সময় তাঁহার কার্য্য শেষ হইল। এইবার তাঁর একবার সুধীয়ার কাছে যাইতে ইচ্ছা হইল, কিন্তু কেমন দ্বিধা বোধ হইতে লাগিল। অবশেষে যাওয়াই স্থির করিলেন। পরিচারিকাকে বলিলেন, "তুমি একেবারে ষ্টেশনে চলিয়া যাও, আমি ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সেখানে যাইতেছি। কাল যে মেয়েটির সঙ্গে দেখা হইয়াছিল, ঐ বাড়ীতে সেই মেয়েটির সঙ্গে একবার দেখা করিয়া আসি।" পরিচারিকা ষ্টেশনের দিকে চলিয়া গেল। আত্রেয়ী সুধীয়ার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন। বাড়ীর সম্মুখে গিয়া দেখিলেন, দরজা ভিতর হইতে বন্ধ। কড়া ধরিয়া নাড়িলেন। সুধীয়া ভিতর হইতে বলিল, "যাই গো।" সে মনে করিয়াছিল, টহলাকা মাতারী বাজার হইতে ফিরিয়াছে। তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া দিয়া টহলার মাতার পরিবর্ত্তে আত্রেয়ীকে

দেখিয়া সুধীয়া কেমন যেন হইয়া গেল। তার ভাবভঙ্গি দেখিয়া মনে হইল, সে যেন ভয়ানক ভয় পাইয়াছে। আত্রেয়ী তাহা বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু সেদিকে মন না দিয়া যথাসম্ভব সপ্রতিভ-ভাবে মুখে একটু হাসি আনিয়া বলিলেন, "কি ভাই, ভাল আছ ত? এক দিনের মধ্যেই ভুলে গেলে নাকি?" সুধীয়া ততক্ষণ সামলাইয়া লইয়া বলিল, "আসুন, আসুন!" এই বলিয়া আত্রেয়ীর হাত ধরিয়া তাঁহাকে বাড়ীর মধ্যে লইয়া গিয়া পূর্ব্বকথিত কক্ষের সেই চেয়ারখানিতে বসাইয়া দরজা বন্ধ করিয়া আসিল। সরোজাক্ষ উঠানের এক কোণে একটা কাঠের ঘোড়ার মুখে দড়ি বাঁধিয়া তার পিঠে চাপিয়া মুখে "হেট্ হেট" করিতেছিল, আর ঘোড়ার গায়ে ছড়ি দিয়া মারিতেছিল, আত্রেয়ীকে দেখিয়া ঘোড়া ছাড়িয়া কোনরূপ ভূমিকা না করিয়া একেবারে আত্রেয়ীর কোলে গিয়া বসিল। আত্রেয়ী আজ বেশ ভাল করিয়া দেখিলেন, এ যেন অল্পবয়স্ক তারক। এ বালক তারকের সন্তান না হইয়া যায় না। তথাপি ছেলেটির উপর আত্রেয়ীর হিংসা হইল না। সুধীয়ার সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়াও তাহার উপর ঈর্ষার উদয় না হইয়া তাহার প্রতি কেমন যেন করুণার উদ্রেক হইল। সেই সঙ্গে তারকের উপর ঘৃণায় মন ভরিয়া উঠিল। এক একবার মনে হইল, সন্দেহের উপর নির্ভর করিয়া এতটা মনে করা ঠিক হইতেছে না। সুধীয়ার নিকট হইতে আর কিছু বাহির করিতে পারা যায় কি না? আত্রেয়ীর সৌভাগ্যক্রমে সেদিন টহলার মা ফিরিতে দেরী করিল।

সুখীয়া কয়েক বৎসর হইতে এখানে আছে। তারক তাহাকে বুঝাইয়াছেন কয়েক বৎসর তাহাকে এইখানেই থাকিতে হইবে, টইলার মা ছাড়া বাহিরের অন্য কোন লোকের সহিত আলাপ করিতে পারিবে না, করিলে তার এবং তারকের বিপদ্ ঘটিবে। ছেলে দুটি জন্মিবার পর হইতে সুখীয়া বেচারি তাদের জন্য সর্ব্বদাই ভয়ে ভয়ে কাটাইত, পাছে তাহাদের কোনরূপ বিপদ্ ঘটে। এ কয়েক বৎসরের মধ্যে সুখীয়া এ বাড়ী ছাড়িয়া কোথাও যায় নাই। তারক ও টইলার মা ছাড়া অন্য কোন লোকের সঙ্গে এ বাড়ীতে তার অতি অল্পই সাক্ষাৎ হইয়াছে। তথাপি সে কোনরূপ অসুবিধা বা কষ্ট বোধ করে নাই। তারক সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন করিয়া সেখানে আসিতেন, কখনও বা দু'দিন থাকিয়াও যাইতেন। ইহাতেই সুখীয়া কৃতার্থ হইত। ছেলে দুটি হইবার পর তার কাজ অনেক বাড়িয়াছে, সে ছেলে দুটির জন্য সব সময়েই কিছু না কিছু করিতেছে। গতকল্য আত্রেয়ীকে বাড়ীর মধ্যে দেখিয়া টইলার মা রাগ করে, বাবুকে বলিয়া দিবে বলিয়া ভয় দেখায়, তাই আজ আত্রেয়ীকে দেখিবামাত্র সুখীয়ার ভয় হইয়াছিল। কিন্তু বেশীক্ষণ সে ভাব ছিল না। গতকল্য আত্রেয়ীকে সুখীয়ার বড় ভাল বোধ হইয়াছিল।

আত্রেয়ী সুখীয়ার সঙ্গে গল্পসল্প করিতে করিতে, সুখীয়ার ছেলেদের আদর করিতে করিতে খুব সাবধানে সুখীয়ার কাছ হইতে অনেক কথা বাহির করিয়া লইলেন। সুখীয়ার ন্যায় সাংসারিক জ্ঞানশূন্যা সরলার নিকট হইতে কথা বাহির করিয়া

লইতে আত্রেয়ীর ন্যায় বুদ্ধিমতী অথচ সুশিক্ষিতা মহিলাকে বিশেষ কষ্ট করিতে হইল না। কথায় কথায় আত্রেয়ী জিজ্ঞাসা করিলেন, “আচ্ছা ভাই, তোমার স্বামী ত সাতদিন অন্তর একদিন এখানে আসেন, পর যদি এর মধ্যে তাঁর এখানে আসার খুব দরকার হয়, তোমার কি ছেলেদের যদি অসুখ হয়, তা হ'লে কি ক'রে তাঁকে খবর দাও? তুমি ত লিখতেও জান না; কলকাতায় কোন্ ঠিকানায় তিনি থাকেন তাও জান না।” সুধীরা হাসিয়া বলিল, “তার উপায় তিনি ক'রে রেখেছেন। তাঁর ঠিকানা লেখা খাম কয়েকখানা তিনি আমার কাছে রেখে গিয়েছেন। এখানে তাঁর আসা দরকার মনে হ'লেই টহলার মাকে দিয়ে সেই খামগুলোর একখানা ডাকে দিলেই তিনি তা পেয়ে সেদিন কি তার পর দিন এসে হাজির হন। আচ্ছা, আমি আপনাকে সেই খাম একখানা এনে দেখাচ্ছি, তা হ'লে আপনি বুঝতে পারবেন। কাল যখন আপনি আমার স্বামীর নাম লিখে দেখাতে বললেন তখন ও খামগুলোর কথা মনেই ছিল না।” সুধীরা উঠিয়া একটা হাতবাক্স খুলিয়া একখানি ঈষৎ নীলবর্ণের খাম বাহির করিয়া আনিয়া আত্রেয়ীর হাতে দিল। খামের উপরে ছাপান ঠিকানা পড়িয়া আত্রেয়ীর মাথা ঘুরিয়া গেল। তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে চেয়ার হইতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছেন দেখিয়া সুধীরা তাড়াতাড়ি তাঁহাকে ধরিয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিল এবং নিকটস্থ কুঁজা হইতে খানিকটা ঠাণ্ডা জল লইয়া তাহাতে গোলাপজল মিশাইয়া আত্রেয়ীর মুখে চোখে মাথায় ছিটাইয়া দিয়া আত্রেয়ীকে বাতাস করিতে লাগিল। সৌভাগ্যক্রমে সেই সময়

সুধীরার ছেলে দুইটি ঘুমাইয়াছিল। মিনিট পাঁচেক মধ্যেই সুস্থ হইয়া আত্রেয়ী উঠিয়া বসিলেন। সুধীরা জিজ্ঞাসা করিল, "হঠাৎ এমন হ'ল কেন? কি অসুখ বোধ হচ্ছে? আর কখন কি এমন হ'য়েছিল?" আত্রেয়ী মানসিক উদ্বেগ অতি কষ্টে দমন করিয়া ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন, "হঠাৎ মাথাটা কেমন ঘুরে উঠ্‌ল। কয়েক দিনের খাটুনিতে শরীরটা কেমন দুর্ব্বল হ'য়েছে, তাই বোধ হয় অমন হ'য়েছিল। যাই হ'ক, এখন বেশ ভাল হ'য়েছি। তুমি ভাগ্যি কাছে ছিলে, নৈলে যে সে জায়গায় হ'লে বোধ হয় মারা প'ড়তাম। বেলা প'ড়ে এল, আজ তা হ'লে আসি ভাই।" সুধীরা বলিল, "না, না আর একটু বসুন। আপনার শরীর এখনও ঠিক হয় নাই। আমাদের দাই টহলার মা আসুক, তার সঙ্গে ইষ্টিশান যাবেন, না হয় সে একখানা ঘোড় গাড়ী ডেকে দেবে, তাতেই যাবেন। এখন একটু জল খান।" আত্রেয়ীকে ধীরে ধীরে বাতাস করিতে করিতে সুধীরা এই কথাগুলি বলিল। আত্রেয়ীর তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছিল, অথচ জল চাহিয়া খাইতে কেমন সঙ্কোচ বোধ হইতেছিল। সুধীরা জল খাইতে বলিলে বলিলেন, "পাখাখানা আমার হাতে দাও, তুমি আমাকে কেবল এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল দাও।" সুধীরা তাড়াতাড়ি একখানা ডিশে করিয়া দুটা রসগোল্লা, কয়েক কুচি শসা, পেয়ারা, নাসপাতি ও বাটার গোটা কয়েক পান আনিয়া আত্রেয়ীর সম্মুখে রাখিয়া তাঁহার হাত হইতে পাখা কাড়িয়া লইয়া বাতাস করিতে করিতে বলিল, "আমি আপনাকে বাতাস কচ্ছি, আপনি একটু কিছু মুখে দিন।" আত্রেয়ী

বলিলেন, "এ সব ত আমি খেতে পারব না ভাই, আমার মোটেই ক্ষিদে পায়নি। খুব তেষ্টা পেয়েছে। কেবল জলটুকু খাব।" সুখীরা বলিল, "তা হবে না। কিছু খেতেই হবে। ক্ষিদে পায়নি বল্লেই শুনি কিনা! সেই এগারটার সময় ত খেয়ে বেরিয়েছেন, এখন ত প্রায় পাঁচটা, এখনও ক্ষিদে পায়নি? এ কথা আমি মানবো না। আপনি আমাকে পর মনে করছেন। তা হ'লে আর আপনি আমার দিদি হ'লেন কেমন ক'রে?. না, আপনাকে কিছু খেতেই হবে, নৈলে ছাড়বো না। কিছু না খেলে আমি রাগ করবো। আমিও তা হ'লে আজ আর কিছু খাব না।" বলিতে বলিতে সুখীরার চোখ দিয়া টস্‌টস্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। তাহা দেখিয়া আত্রেয়ী আঁচল দিয়া সস্নেহে সুখীরার মুখ মুছাইয়া দিলেন। সুখীরার ওপর তাঁর একটুকুও রাগ বা বিরক্তি হইল না, সস্নেহে সুখীরার পিঠে হাত দিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, খাচ্চি, খাচ্চি। তুমি যে এত অভিমানিনী তা ভাবতে পারিনি।" অমনি সুখীরার মুখে হাসি দেখা দিল এই মেঘ ও রৌদ্রের খেলা আত্রেয়ীর কাছে বড় মিষ্ট বোধ হইল।

আত্রেয়ী কিছু খাইলেন। আত্রেয়ীর খাওয়া শেষ হইবার পূর্ব্বেই হাবলার নিদ্রাভঙ্গ হইল। সে জাগিয়া তার পূর্ব্বদিনের মাসীকে দেখিয়া আনন্দে হাততালি দিয়া লাফাইয়া উঠিয়া মাসীর গলা জড়াইয়া ধরিল। আত্রেয়ী তাহাকে কোলের ভিতর টানিয়া লইয়া অবশিষ্ট খাদ্যদ্রব্যগুলি তাহাকে খাওয়াইয়া দিলেন। তাহা

খিয়া সুধীরা হাসিয়া বলিল, "আপনি ত খুব খেলেন দেখছি ; বই ত ঐ পেটুকটাকে দিলেন।"

আত্রেয়ী মুখহাত ধুইয়া একটা পান মুখে দিয়া হাসিয়া বলিলেন, না ভাই, খুব খেয়েছি। এইবার আমার শরীরের আর কোন নি নাই। এখন আমি একলাই ষ্টেশনে যেতে পারবো।"

সুধীরা। দেখুন, পারবেন ত। আর একটু না হয় অপেক্ষা রুন, টহলার মা এলো ব'লে।

সুধীরার ছোট ছেলেটি তখনও ঘুমাইতেছিল। ঘুমন্ত খোকা-কে চুম্বন করিয়া হাবলাকে বাড়ীর দরজা পর্য্যন্ত কোলে করিয়া নিয়া আদরের চোটে তাহাকে অস্থির করিয়া তাহাকে কোল তে নামাইয়া দিয়া আত্রেয়ী সুধীরার নিকট বিদায় লইলেন। বলা তার মাসীর সঙ্গে বাহিরে যাইতে চাহিল। সুধীরা হাকে জোর করিয়া আটকাইয়া দুয়ার বন্ধ করিয়া দিল। বলা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া মাতার কার্য্যের বিরুদ্ধে ঘোর ন্দোলন উপস্থিত করিল।

২৩

আত্রেয়ী বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া মনে মনে সুধীরাঘটিত পারের আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁর স্থির বিশ্বাস ন্মল যে, সুধীরার ছেলে দুটি তারক রাওয়ের ছেলে। তবে কি ধীরা তারকের বিবাহিতা পত্নী? কিম্বা?—না, সুধীরার বভঙ্গী দেখিয়া তাহাকে পতিতা বলিয়া কিছুতেই সন্দেহ হয় না।

যদি সুখীয়া তারকের বিবাহিতা পত্নী হয়, তাহা হইলে তারক সুখীয়াকে কখন বিবাহ করিয়াছে? আত্রেয়ীর সহিত বিবাহের পূর্ব্বে না পরে? যদি আত্রেয়ীর সহিত বিবাহের পূর্ব্বে হইয়া থাকে, তাহা হইলে তারকের সহিত আত্রেয়ীর বিবাহ অসিদ্ধ,—আর যদি আত্রেয়ীর সহিত বিবাহের পর সে সুখীয়াকে বিবাহ করিয়া থাকে, তাহা হইলে সুখীয়া কখনই তারকের পত্নী হইতে পারে না। যে দিক্ দিয়াই ব্যাপারটা দেখা যাউক না কেন, তারক, আত্রেয়ী ও সুখীয়া উভয়ের প্রতিই বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে। আত্রেয়ী মনপ্রাণ দিয়া তারককে ভালবাসিয়াছে, সেই ভালবাসার কি এই প্রতিদান? তারক অন্য রমণীর প্রণয়ে আবদ্ধ! এরূপ লোকের সহিত আত্রেয়ী কোন সম্বন্ধ রাখিতে চায় না, রাখিতে পারে না। বিশ্বাসঘাতক তারক নিশ্চয়ই সরলা সুখীয়াকে ভুলাইয়াছে। আত্রেয়ীর মত উচ্চ শিক্ষিতা মহিলাই যখন তারককে চিনিতে পারে নাই, তখন সুখীয়ার ন্যায় বর্ণজ্ঞানশূন্যা সরলার পক্ষে তা সম্ভব হইতে পারে না। আত্রেয়ী ও সুখীয়া এ দুয়ের মধ্যে কে তারকের বিবাহিতা স্ত্রী? যদি সুখীয়া হয়, তাহা হইলে আত্রেয়ী তাহা জানিতে পারিয়া তারকের সহিত আর কোন সম্পর্ক রাখিতে পারে না, যদি আত্রেয়ীই তারকের বিবাহিতা পত্নী হয়, তাহা হইলেও তারকের ন্যায় বিশ্বাসঘাতকের সহিত আত্রেয়ীর সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করা কর্ত্তব্য। এজন্য যদি আদালতের আশ্রয় লইতে হয়, তাহা করিতেও আত্রেয়ী প্রস্তুত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যদি আত্রেয়ীর স্বামী তারক রাও এবং সুখীয়ার স্বামী তারক রাও

অভিন্ন না হয়? যদি দুইজন ভিন্ন ব্যক্তির নামের এবং আকৃতির বিস্ময়জনক সাদৃশ্য থাকে, তাহা হইলে আত্রেয়ী তাঁহার স্বামীর উপর অকারণ সন্দেহ করিয়া স্বামীর প্রতি অবিচার করিতেছেন। নামের ও আকৃতির সাদৃশ্য না হয় থাকিল, কিন্তু তারক রাও নামক দুইজন এম, এ উপাধিধারী অধ্যাপক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আছেন এমন ত শুনিতে পাওয়া যায় নাই। বর্ত্তমান বৎসরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পঞ্জিকা দেখিলেই সে সন্দেহের নিরশন হইতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সে বৎসরের পঞ্জিকা (calendar) বাড়ীতেই ছিল। আত্রেয়ী তাড়াতাড়ি উঠিয়া পুস্তকের আলমারী হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন পঞ্জিকাখানি বাহির করিয়া এম, এ উপাধিধারীদের তালিকায় একজন মাত্র তারক রাওয়ের নাম দেখিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত কলেজগুলির অধ্যাপকের তালিকায় একজন মাত্র তারক রাওয়ের নাম দেখিলেন। তখন আত্রেয়ীর মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল যে, সুধীরার নিকট যে তারক রাওয়ের ঠিকানা লেখা খাম পাওয়া গিয়াছে, সেই তারক রাও আত্রেয়ীর স্বামী বলিয়া সমাজে পরিচিত।

আত্রেয়ী একখানা আরামকেদারায় শুইয়া এই সকল কথা দেশকালপাত্র ভুলিয়া ভাবিতেছেন। ভাবিতে ভাবিতে রাত্রি একপ্রহর হইয়া গিয়াছে। তথাপি আত্রেয়ীর সেদিকে দৃষ্টি নাই। আত্রেয়ীকে এইরূপে শুইয়া শুইয়া ভাবিতে দেখিয়া নিমায়ের মা ঝি আর থাকিতে না পারিয়া আত্রেয়ীর কাছে গিয়া বলিল, "আত্তি দিদি; শুয়ে শুয়ে এক পহর ধ'রে ভাবছ কি বল দেখি? জামাইবাবুর

চিঠি ক'দিন পাও নি ব'লে ভাবছিলে, তা জামাইবাবুর ত আজ চিঠি এসেছে, তবুও ভাবছ কেন? জামাইবাবু বেশ ভাল আছেন ত?" নিমায়ের মার একটি কথাও ভাল করিয়া আত্রেয়ীর কাছে গেল না। আত্রেয়ী কেমন অন্যমনস্কভাবে বলিলেন, "কি বলিতেছিস?" নিমায়ের মা বলিল, "বল্‌ছি কি যে মাসের আজ ক'দিন। বলি, জামাইবাবু চিঠিতে কি লিখেছেন?" আত্রেয়ী চমকিত হইয়া বলিলেন, "জামাইবাবুর চিঠি? কৈ আমি ত জানি না।" নিমায়ের মা গালে হাত দিয়া জিহ্বা দ্বারা বিস্ময়সূচক শব্দ করিয়া বলিল, "ও মা বল কি? জগুয়া যে বল্লে জামাইবাবুর চিঠি এসেছে, তোমার টেবিলের ওপর রেখে গেল।" আত্রেয়ী তাঁর পড়ার টেবিলের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, তাঁর নামের চিঠিপত্র আসিলে চাকর যে স্থানে তা রাখিয়া দেয়, সে স্থানে খান চার পাঁচ চিঠি রহিয়াছে। এতক্ষণ সে দিকে আত্রেয়ীর লক্ষ্যই ছিল না। এইবার আত্রেয়ী আরামকেদারা হইতে উঠিয়া চিঠিগুলি তুলিয়া লইয়া দেখিলেন, সেগুলির মধ্যে তারকের লেখা একখানি চিঠি রহিয়াছে। তা দেখিয়া মনের ভাব গোপন করিয়া ঠোঁটের উপর একটুখানি শুষ্ক হাসি টানিয়া আনিয়া নিমায়ের মাকে বলিলেন, "এই যে তোর জামাইবাবুর চিঠি এসেছে। এখন তুই যা। আমার খাবার এই ঘরে ঠাকুরকে দিয়ে যেতে বল্। আজ আমার ক্ষিদে নেই, পারি ত একটু বেশী রাত্রে খাব। তোরা খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়গে।" নিমায়ের মা একটুখানি দরদ দেখাইয়া বলিল, "পহরখানেক বাদে আমি এসে একবার দেখে যাব।" এই কথা

শুনিয়া এত মনের কষ্টের মধ্যেও আত্রেয়ী একটু না হাসিয়া থাকিতে পারিলেন না। নিমায়ের মাতা নিদ্রা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের "পুরাতন ভৃত্য কৃষ্ণকান্তের" পিতামহী হইবার উপযুক্তা। দিবসে, রাত্রে, সন্ধ্যায় যেখানে সেখানে একবার শয়ন করিবামাত্রই নিমায়ের মাতা গভীর নিদ্রায় মগ্ন হইয়া যাইত, কানের কাছে ঢাক্ বাজাইলে বা তাকে দু'দশ ঘা দিলেও তার সে ঘুম সহজে ভাঙ্গিত না। পাকা ছয় ঘণ্টা না ঘুমাইলে নিমায়ের মার ঘুম ভাঙ্গিত না।

নিমায়ের মা চলিয়া গেলে আত্রেয়ী তারক রাওয়ের চিঠিখানি খুলিয়া পড়িতে বসিলেন। চিঠিখানির ছত্রে ছত্রে আত্রেয়ীর প্রতি তারক রাওয়ের অকৃত্রিম প্রেম ফুটিয়া উঠিয়াছে। অন্য সময় হইলে আত্রেয়ী এই চিঠি কতবারই না প্রেমবিহ্বল-হৃদয়ে পাঠ করিতেন, কিন্তু আজ এ চিঠিখানির প্রত্যেক অক্ষর তাঁর হৃদয়ে তপ্ত লৌহ-শলাকার ন্যায় বিদ্ধ হইতেছিল। আত্রেয়ী ভাবিলেন, এই চিঠি যে লিখিয়াছে, সে কি ভয়ানক বিশ্বাসঘাতক! চাণক্যপণ্ডিত যাহাকে বলিয়াছেন "বিষকুম্ভ পয়োমুখ" এযে দেখিতেছি অবিকল তাই। এর মুখে মধু হৃদয়ে হলাহল। এই লোকের সংস্রব আর আমি রাখিব না, ইহার স্মৃতিও আমার কাছে কেমন বিষাক্ত ও অপবিত্র বোধ হইতেছে। রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র আমি এ গৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইব। এ গৃহ আমার পিতার হইলেও এ গৃহে ও ব্যক্তির অংশ আছে। এ গৃহ ত্যাগ করিয়া আমার যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাইব। কোথায় যাইব? যাইতে পারিব কি? কেন পারিব না? আমি হিন্দুগৃহের বধূ, লজ্জাবতী লতা নই।

আমি উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্তা, কাহাকেও অনর্থক ভয় করি না। আমার চলিবে কিসে?' কেন বাবার লাইব্রেরী বেচার দরুণ কয়েক হাজার টাকা ব্যাঙ্কে জমা আছে, সেই টাকাতেই আমার একজনের চলিবে। আমি কি করিব? কাজের অভাব কি? কাজের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে। রামকৃষ্ণমিশনের সেবক-সেবিকাদের সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া আর্ত্তদিগের সেবায় জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করিব এবং যাঁর কথা এতদিন মোটেই চিন্তা করি নাই, অন্যে যাঁর প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলে অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়াছি, এখন সেই অগতির গতি ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া শান্তিলাভ করিবার চেষ্টা করিব। আজ রাত্রি দুটা আড়াইটা পর্য্যন্ত জাগিয়া আয়োজন করিয়া রাখি। কাল বেলা সাড়ে দশটার গাড়ীতে কাশী যাত্রা করিব।" কিছু খাইয়া যাইতে হইবে, নহিলে চাকর ঝিরা গোলমাল করিবে। একটা সুবিধা হইবে। ও ব্যক্তি লিখিয়াছে, তাহার ফিরিতে আরও সাত দিন দেরী হইবে। তার নামে আমি একখানা চিঠি লিখিয়া রাখিয়া যাইব? না কাশী গিয়া সেখান হইতে একখানা চিঠিতে সব কথা লিখিয়া পাঠাইলেই চলিবে। এখন একখানা চিঠিতে কেবল এইমাত্র লিখিয়া যাইব যে, আমি কাশী চলিলাম। কেমন পরিচ্ছদ ধারণ করিব। সন্ন্যাসিনীর ন্যায় গৈরিক বস্ত্র পরিধান করিব। কাল সকালে উঠিয়াই দু'খানা কাপড় আর একখানা মোটা বিছানার চাদর গিরিমাটি দিয়া রঙ্গাইয়া লইব। একটা হাত-ব্যাগে সেই কাপড় কয়খানা, খানদুই বই, আর কয়েকটা টাকা

লইয়া রওনা হইব। এখানে গৈরিক বস্ত্র পরিধান করিব না, ঝি, চাকরেরা হৈ চৈ করিবে। এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া রাত্রি একটা পর্য্যন্ত আবশ্যকীয় আয়োজন করিয়া তারকের নামে একখানি সংক্ষিপ্ত চিঠি লিখিয়া সেখানি যথাস্থানে রাখিয়া আত্রেয়ী শুইয়া পড়িলেন। ভাবিলেন, এইবার নিশ্চিন্ত হইলেন। আর তারকের কথা ভাবিবেন না। কিন্তু কার্য্যতঃ তা হইল না। যতই ভাবেন ভাবিবেন না ততই কত কথাই যে মনে হয়! ভাবিতে ভাবিতে কখন ঘুমাইয়া পড়িলেন। ঘুম ভাঙ্গিলে উঠিয়া দেখিলেন, বেলা প্রায় আটটা। তাড়াতাড়ি স্নান করিয়া লইলেন, আহার করিতে দশটা বাজিল! কাপড় ও বিছানার চাদর গৈরিক বর্ণে রঞ্জিত করিবার সুবিধা পাইলেন না; ভাবিলেন, কাশী গিয়া তা করিয়া লইবেন।

সাড়ে দশটার ট্রেণে আত্রেয়ী কাশীযাত্রা করিলেন। নিমায়ের মা সঙ্গে যাইতে চাহিল, আত্রেয়ী কাহাকেও সঙ্গে লইলেন না। দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট লইয়া একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় উঠিলেন। মোগলসরাই পর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে কাটিয়া গেল। মোগলসরায়ে কাশীযাত্রী ট্রেণের দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় আত্রেয়ী একাকিনী বসিয়া রহিয়াছেন। ট্রেণ ছাড়িতে আর দুই তিন মিনিট দেরী আছে, এমন সময় দুইটি ইংরেজ-মহিলা একজন ইংরেজ পুরুষ সহ সেই কামরায় প্রবেশ করিয়া তাহাতে একজন এদেশীয় স্ত্রীলোককে দেখিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া সুগন্ধি পুষ্পসারসিক্ত রুমাল নাকের কাছে ধরিয়া মিহিসুরে ইংরেজমহাশয়কে

জানাইলেন যে, নেটিভ স্ত্রীলোকটি এ কামরায় থাকিলে তাঁহাদের আরামের ব্যাঘাত হইতে পারে। ও জানোয়ারটিকে এ কামরা হইতে সরাইতে হইবে। তাহা শুনিয়া ইংরেজপুঙ্গব অপূর্ব্ব হিন্দুস্থানী ভাষায় আত্রেয়ীকে সে কামরা ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে বলিলেন। আত্রেয়ী বিশুদ্ধ ইংরাজীতে বলিলেন, "তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট কিনিয়াছেন, এ কামরায় তিনি বেশ আছেন, যদি কাহারও অসুবিধা হয়, তিনি অন্যত্র যাইতে পারেন।" ইংরেজপ্রবর আত্রেয়ীর মুখে বিশুদ্ধ ইংরাজী শুনিয়া কিছুমাত্র না দমিয়া দম্ভভরে কহিলেন, "ইহা ইংরেজদের জন্য রিজার্ভ করা গাড়ী, সুতরাং নেটিভ স্ত্রীলোককে এ গাড়ীতে উঠিতে দেওয়া হইবে না।" আত্রেয়ী বলিলেন, "এ কামরা কাহারও জন্য রিজার্ভ করা হয় নাই। ষ্টেশনমাষ্টার আসিলে তাঁর সঙ্গে এ বিষয়ে বোঝাপড়া হইবে। আমি কামরা হইতে নামিব না।" ইংরেজবীর চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বলিলেন, "না নামিলে আমি তোমাকে জোর করিয়া নামাইয়া দিব।" আত্রেয়ী দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "আপনার যাহা ইচ্ছা হয় করিবেন। আমি কখনও আমার অধিকৃত স্থান ত্যাগ করিব না।" ইংরেজপ্রবর আর স্থির থাকিতে পারিলেন না "তোমাকে তোমার ধৃষ্টতার উপযুক্ত প্রতিফল দিতেছি" ক্রুদ্ধস্বরে এই কথাগুলি উচ্চারণ করিয়া আত্রেয়ীর হাত ধরিয়া তাঁহাকে জোর করিয়া সেই কামরা হইতে নামাইয়া দিবার জন্য বেগে আত্রেয়ীর দিকে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু অগ্রসর হইতে পারিলেন না। সেই মুহূর্ত্তে এক ব্যক্তি বজ্রমুষ্টিতে সেই ইংরেজ-

বীরের গলদেশ চাপিয়া ধরিল। ইংরেজপ্রবর নড়ন চড়ন রহিত হইয়া পড়িলেন। এমন সময়ে গাড়ী ছাড়িয়া দিল। ইংরেজপ্রবরের অঙ্গে হস্তার্পণকারী ব্যক্তি তাঁহার দৃঢ়মুষ্টি শিথিল করিলেন। ইংরেজপ্রবর তাড়াতাড়ি নিজেকে সেই ব্যক্তির কবল হইতে মুক্ত করিয়া ঘাড় ফিরাইয়া চাহিয়া দেখিলেন, ধুতি-চাদর পরা এক বাঙ্গালী তাঁর পশ্চাতে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ইংরেজপুঙ্গব ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া সেই বাঙ্গালীটির দিকে মুখ ফিরাইয়া চীৎকার করিয়া যা ইংরেজীতে বলিলেন তার মর্ম্ম এই, "ওরে শূয়ার, তুই কেন এ কামরায় অনধিকার প্রবেশ করিয়াছিস? তুই কেন আমার গায়ে হাত তুলিয়াছিস্? এজন্ত তোর ফাঁসি হইবে।" বাঙ্গালী ভদ্রলোকটি ঈষৎ হাসিয়া যাহা বলিলেন তার মর্ম্ম এই "সাহেব, তুমি ভদ্রলোক হও, চুপ করিয়া বসিয়া থাক, বেশী বক্‌বক্ কর ত এক ঘুসিতে আমি তোমার দু'পাটি দাঁতই ভাঙ্গিয়া দিব। তুমি কেন এই ভদ্রমহিলাকে জোর করিয়া এ কামরা হইতে নামাইতে উদ্যত হইয়াছিলে? আমি সব দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি।" সাহেব বলিলেন, "তোমাকে কে অনধিকার চর্চ্চা করিতে বলিল? বাঙ্গালী ভদ্রলোক বলিলেন, "ইহাকে অনধিকার চর্চ্চা বলে না। কাহাকেও বিপন্ন দেখিলে তাহাকে সাহায্য করিবার অধিকার সকলেরই আছে।"

সাহেব। তোমার কোন্ শ্রেণীর টিকিট আছে?

বাঙ্গালী। আমার কোনও শ্রেণীর টিকিট নাই। তোমার অত্যাচার নিবারণ জন্ত আমি বিনা টিকিটে গাড়ীতে উঠিয়াছি।

সাহেব। আমি তোমাকে পুলিশে দিব।

বাঙ্গালী। স্বচ্ছন্দে। আমি তোমার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনিব যে, তুমি একজন ভদ্রমহিলাকে জোর করিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ী হইতে নামাইয়া দিতে উদ্যত হইয়াছিলে। তুমি আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন কর আর নাই কর, আমি তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করিব, আর এই ইংরেজ-মহিলাদ্বয়কে সাক্ষী মানিব। দেখি, উহারা হলফ করিয়া কি বলেন।

সাহেব। আচ্ছা তা দেখা যাইবে। তোমার নাম কি?

বাঙ্গালী। আমার নাম বলিতে আপত্তি নাই। কিন্তু তোমার নাম কি জানিতে চাই।

সাহেব। তোমার মত লোককে আমার নাম বলিতে বা আমার কার্ড দিতে আমি বাধ্য নহি।

বাঙ্গালী। তাহা হইলে আমারও সেই কথা।

সাহেব। আমি তোমাকে গাড়ী হইতে নীচে ফেলিয়া দিব।

বাঙ্গালী। তাহাতেও আমার আপত্তি নাই। আইস, দেখি কে কা'কে গাড়ী হইতে ফেলিয়া দিতে পারে।

দেখিতে দেখিতে ট্রেণ বেনারস ক্যাণ্টনমেণ্ট ষ্টেশনে পৌছিল। সাহেব তাড়াতাড়ি ট্রেণ হইতে নামিয়া ষ্টেশনমাষ্টারকে গিয়া কি বলিলেন। ষ্টেশনমাষ্টার ফিরিঙ্গি। ষ্টেশনমাষ্টার আত্রেয়ীর অধিকৃত কামরার সম্মুখে কয়েকজন রেলওয়ে পুলিশ লইয়া হাজির হইয়া বাঙ্গালীটিকে সম্বোধন করিয়া ইংরাজীতে যাহা বলিলেন

তাহার মর্ম্ম এই, "তুমি বিনা টিকিটে দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় প্রবেশ করিয়া এই কামরার আরোহীদের বিরক্ত করায় তোমার বিরুদ্ধে এই ভদ্রলোক অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন। তুমি বিনা টিকিটে দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় উঠিয়াছ, জরিমানা সহ ভাড়া তোমাকে দিতে হইবে।" বাঙ্গালী বলিলেন, "কত দিতে হইবে?"

ষ্টেশনমাষ্টার তাহা বলিলে, বাঙ্গালীবাবুটি টাকা দিতে উদ্যত হইলে আত্রেয়ী বলিলেন, "আপনি বিপদের সময় আমার সাহায্য করিতে গিয়া অনর্থক বিপন্ন হইতেছেন। আমি টাকা দিতেছি। আমার জন্য আপনি কেন আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিবেন?"

বাঙ্গালীবাবুটি বলিলেন, "আপনি সে জন্য কিছু মনে করিবেন না।" এই বলিয়া ষ্টেশনমাষ্টারের হাতে টাকা দিলেন। ষ্টেশনমাষ্টার আর এক কর্ম্মচারীকে টাকা দিয়া বাঙ্গালীবাবুকে একখানি রসিদ লিখিয়া দিলেন এবং বাঙ্গালীবাবুটিকে ও আত্রেয়ীকে দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের বিশ্রামকক্ষের সম্মুখস্থিত বারাণ্ডায় অপেক্ষা করিতে বলিলেন। ইতিমধ্যে সেই সাহেবটি সেস্থান হইতে রেলওয়ে ষ্টেশনের পুলিশ-আফিসে গিয়া বাঙ্গালীবাবুটির বিরুদ্ধে এজাহার করিয়াছিলেন। রেলওয়ে পুলিশের দারোগা সাহেবটিকে সঙ্গে করিয়া বাঙ্গালীবাবুটির নিকট আসিয়া হিন্দুস্থানী ভাষায় বলিলেন, "এই সাহেব আপনার বিরুদ্ধে নালিশ করিয়াছেন। আপনার নাম কি বলুন?"

বাঙ্গালীবাবু। আমার নাম নবীনচন্দ্র মজুমদার।

ইহা শুনিয়া আত্রেয়ী চমকিয়া উঠিলেন। ইনি কোন্ নবীন

মজুমদার? দারোগা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনার পেশা কি, আপনার মোকাম কোথায়?"

বাঙ্গালীবাবু। আমি 'হক্ কথা' ও "Fairly Play" এই দুইখানি সংবাদপত্রের সম্পাদক। আমার মোকাম—নং কলেজ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

আত্রেয়ী এতক্ষণ বসিয়াছিলেন, এইবার দাঁড়াইয়া বলিলেন, "বলেন কি? আপনি 'হক্ কথা' সম্পাদক নবীনবাবু! আমি এতক্ষণ আপনাকে মোটেই চিনিতে পারি নাই! আপনার চেহারার বিস্ময়জনক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।"

নবীন মজুমদার। হাঁ, কিন্তু আপনাকে ত চিনিতে পারিতেছি না।

দারোগা। আপনাদের আলাপ এখন স্থগিত রাখুন। আপনি যদি জামিন দিতে পারেন, তাহা হইলে আপনাকে এখন খালাস দিতে পারি। আগামী কল্য বেলা এগারটার সময় আপনাকে ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের নিকট উপস্থিত হইতে হইবে।

নবীন মজুমদার। কত টাকার জামিন দিতে হইবে?

দারোগা। তিন শত টাকার।

নবীন মজুমদার। আমি নগদ তিন শত টাকা জমা দিলে হইবে কি না?

দারোগা। খুব হইবে! আপনি আমাদের আফিসে চলুন।

নবীন মজুমদার। "আচ্ছা চলুন, এই সাহেবের বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ আছে, আমার এজাহার আপনাকে লিখিয়া লইতে

হইবে।” এই কথা শুনিয়া দারোগার কেমন ভ্যাবাচাকা লাগিয়া গেল। তিনি মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিলেন, “বলেন কি! আপনি সাহেবের নামে নালিশ করিবেন? আপনি পরে নালিশ করিতেছেন, আপনার মামলা টিকিবে না।”

নবীন মজুমদার। আচ্ছা সে যাহা হয় আমি বুঝিব, আপনি আমার এজাহার লিপিবদ্ধ করিবেন কিনা তাহাই বলুন।

দারোগা। আমি তাহা করিতে বাধ্য। কিন্তু আমি আপনাকে সাবধান করিয়া দিতেছি। সাহেব লোকের বিরুদ্ধে অভিযোগ যদি প্রমাণ করিতে না পারেন, তাহা হইলে আপনাকে খেলাপ এজাহারের দায়ে পড়িতে হইবে।

নবীন মজুমদার। আমার জন্য আপনার এত উদ্বেগ প্রকাশ করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ করিতেছি, কিন্তু আপনার উপদেশ গ্রহণ করিতে পারিলাম না। সাহেবের নামে আমি নালিশ করিবই। সাহেবটি আমাকে তাঁর নাম বলিতে অস্বীকার করিয়াছেন। আপনি অবশ্য সাহেবের নাম জানেন।

দারোগা। হাঁ জানি, সাহেবের নাম মিঃ লরেন্স ফাঙ্কি।

নবীন মজুমদার। কি! লরেন্স মানকি!

দারোগা। না, মিঃ ফাঙ্কি। দরবারপুর নীলকুঠির বড় সাহেব।

নবীন মজুমদারকে লইয়া দারোগা রেলওয়ে ষ্টেশনের পুলিশ অফিসের দিকে চলিলেন। নবীন মজুমদার দারোগার সহিত যাইবার সময় আত্রেয়ীকে বলিয়া গেলেন, “আপনি একটু অপেক্ষা

করুন। আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে এখানে আসিয়া আপনার থাকিবার ব্যবস্থা করিতেছি। আপনার ভাবগতিক দেখিয়া মনে হইতেছে, আপনি ইতিপূর্ব্বে কাশীধামে আইসেন নাই।"

আত্রেয়ী। আপনার অনুমান সত্য। আমি আপনার নিকট চিরদিনের জন্য কৃতজ্ঞ রহিলাম।

মিনিট দশেকের মধ্যেই নবীন মজুমদার আত্রেয়ীর নিকট ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "আমি আপনাকে যেন কোথায় দেখিয়াছি মনে হইতেছে। আপনি ত আমায় চেনেন দেখিতেছি। আপনার পরিচয় দিতে আপত্তি আছে কি ?"

আত্রেয়ী। না।

নবীন মজুমদার। আপনার নাম কি ?

আত্রেয়ী। আমার নাম আত্রেয়ী।

নবীন মজুমদার। আত্রেয়ী! কোন আত্রেয়ী! আমাদের তারক রাওয়ের বিদুষী পত্নী আত্রেয়ী!

আত্রেয়ী। আমার তাহাই পরিচয়।

নবীন মজুমদার। এতক্ষণে আপনাকে চিনিতে পারিলাম। আপনাদের বিবাহের সময় এবং তারপর দু'একবার মাত্র আপনাকে দেখিয়াছিলাম, তাই পূর্ব্বে চিনিতে পারি নাই। বয়সের ধর্ম্মে দৃষ্টিশক্তিহীন হইয়াছে। তারক ত দার্জ্জিলিঙ্গে রহিয়াছেন। আপনি কি উদ্দেশ্যে এখানে আসিয়াছেন? কোথায় যাইবেন?

আত্রেয়ী কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, "আমি এখানকার রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাশ্রমে যাইব বলিয়া আসিয়াছি।"

নবীন মজুমদার। আমি এখানে আসিয়া কখনও কখনও সে স্থানেও থাকি। চলুন, আপনাকে সে স্থানে রাখিয়া আসি।

এই বলিয়া নবীন মজুমদার একখানি ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিয়া তাহাতে আত্রেয়ীকে আরোহণ করাইয়া নিজে গাড়ীর উপর কোচবাক্সে বসিলেন। গাড়োয়ানকে রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে গাড়ী লইয়া যাইতে বলা হইল। যথাসময়ে গাড়ী রামকৃষ্ণ-সেবাশ্রমের দ্বারদেশে পৌঁছিল। নবীন মজুমদার নামিয়া আত্রেয়ীকে নামাইলেন। ঠিক সেই সময়ে সেই আশ্রমের অন্যতম কার্যাধ্যক্ষ স্বামী বিজয়ানন্দ সেই স্থানে উপনীত হইয়া নবীন মজুমদারকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "নবীনবাবু যে! আমার বিশ্বাস ছিল, আপনি কলিকাতা চলিয়া গিয়াছেন। আসুন, আপনারা এই ঘরে আসিয়া বসুন। (আত্রেয়ীকে লক্ষ্য করিয়া) ইনি কে?"

নবীন মজুমদার। ইনি অধ্যাপক তারক রাওয়ের বিদুষী পত্নী শ্রীমতী আত্রেয়ী দেবী।

বিজয়ানন্দ স্বামী আত্রেয়ীকে নমস্কার করিলেন। আত্রেয়ী নত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। স্বামী বিজয়ানন্দ নবীন মজুমদারের নিকট রেলগাড়ী-সংক্রান্ত ব্যাপার শুনিয়া বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "এই সকল নীচমনা ইংরেজই বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের প্রকৃত শত্রু।"

আত্রেয়ী বাড়ীতে সঙ্কল্প করিয়া আসিয়াছিলেন যে, কাশীর

রামকৃষ্ণ-সেবাশ্রমে সেবিকাশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইবেন, এখানে আসিয়া কিন্তু তাঁহার কেমন দ্বিধা বোধ হইতে লাগিল। কোনও স্ত্রীলোককে সেবিকাশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা সম্বন্ধে নিয়ম অত্যন্ত কড়া। সেবিকা হইতে ইচ্ছুক মহিলা সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করিয়া কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির মত হইলে তবে তাঁহাকে সেবিকা-শ্রেণীভুক্ত করিয়া লওয়া হয়।

আত্রেয়ীর দ্বিধার ভাব লক্ষ্য করিয়া স্বামী বিজয়ানন্দ বলিলেন, "আমাদের আশ্রমের পার্শ্বেই প্রণব স্বামীর আশ্রম। আগামী কল্য প্রাতঃকালে আপনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। তাঁর সহিত কথাবার্ত্তার পর আপনি অতি সহজেই কর্ত্তব্য স্থির করিতে পারিবেন। তাঁহার কাছে গিয়া প্রণাম করিয়া বসিয়া থাকিলেই তিনি জিজ্ঞাসু ব্যক্তির মনের ভাব অবগত হইয়া তাহাকে সংক্ষেপে জিজ্ঞাস্য বিষয়ের উত্তর দেন। অনেকের নিকট স্বামীজির অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রহেলিকা বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায়, স্বামীজির উত্তর গভীর অর্থপূর্ণ।"

আত্রেয়ীকে সেবাশ্রমের মহিলা বিভাগের অধিনেত্রীর জিম্মা করিয়া দেওয়া হইল। তিনি আত্রেয়ীকে সেবাশ্রম-সংক্রান্ত নিয়মাবলী বুঝাইয়া দিলেন। স্থির হইল, নবীন মজুমদারের মোকর্দ্দমার বিচার শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত আত্রেয়ী এইখানেই থাকিবেন। তার পর প্রণব স্বামীর উপদেশ শুনিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিবেন।

পরদিবস প্রাতঃকালে স্নানান্তে আত্রেয়ী প্রণব স্বামীর নিকট

গিয়া দেখিলেন, স্বামীজিকে দেখিয়া অশীতিপর বৃদ্ধ বলিয়া বোধ হইলেও তিনি যোগীর ন্যায়

"সমংকায় শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ।
সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্"

অবস্থান করিতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়াই তাঁহার প্রতি আত্রেয়ীর মন সম্ভ্রমে পূর্ণ হইল। আত্রেয়ী বিজয়ানন্দ স্বামীর উপদেশমত প্রণব স্বামীকে প্রণাম করিয়া যোড়হাতে তাঁহার সম্মুখে বসিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব। তারপর প্রণব স্বামী নীরবতা ভঙ্গ করিয়া বলিলেন,

"ভর্ত্তুর্বিপ্রকৃতাপি রোষণতয়া মাস্মপ্রতীপং গম।"

কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া পুনরায় গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন,

"তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং
প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যং
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম্॥"

স্বামীজির বিশুদ্ধ উচ্চারণ শুনিয়া আত্রেয়ী মুগ্ধ হইলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে স্বামীজি পুনরায় বলিলেন, "মায়ি, তুমি সুজাতা মায়ীর কাছে যাও, তিনি তোমার মনের সংশয় দূর করিয়া দিতে চেষ্টা করিবেন।

আত্রেয়ী বলিলেন, "বাবা, সুজাতা কে, কোথায় গেলে তাঁর সাক্ষাৎ পাইব?"

স্বামীজি। "মায়ি, আজ সন্ধ্যার পর সুজাতাকে তোমার কাছে

পাঠাইয়া দিব। তুমি এখন যাইতে পার।" আত্রেয়ী স্বামীজিকে প্রণাম করিয়া বিদায় হইলেন।

আশ্রমে ফিরিয়া গিয়া আত্রেয়ী স্বামীজির কথা ভাবিতে লাগিলেন—"স্বামীজি আমাকে লক্ষ্য করিয়া যে শ্লোক উচ্চারণ করিয়াছেন তাহার অর্থ কি? বিজয়ানন্দ স্বামী বলিয়াছেন, প্রণব স্বামীর কথা প্রহেলিকার ন্যায় বোধ হইলেও তাহা গভীর অর্থপূর্ণ। প্রণব স্বামী প্রথমে বলিলেন "ভর্ত্তুর্বিপ্রকৃতাপি রোষণতয়া মাস্ম প্রতীপং গম।" ইহার দ্বারা তিনি কি আমাকে স্বামীর বিরুদ্ধাচরণ করিতে নিষেধ করিলেন? শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতার একাদশ সর্গের "তস্মাৎ প্রণম্য প্রাণধারকায়ং" শ্লোকটি বলার অর্থ কি? "পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম।" ইহা দ্বারা কি স্বামী স্ত্রীর মধ্যে পরস্পরকে পরস্পরের অপরাধ ক্ষমা করিবার উপদেশ দিয়াছেন? স্বামীজি কেমন করিয়া জানিলেন যে, আমি স্বামীর উপর বিরক্ত হইয়া বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছি? কেমন করিয়া জানিলেন যে, আমি সংস্কৃত ভাষা জানি। সুজাতা কে? সুজাতা আমার মনের সংশয় দূর করিবে এ কথা বলার অর্থ কি? আজ সন্ধ্যার পর ত সুজাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবেই, তখন ব্যাপারটা ভাল করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিব। এখন সব কেমন গোলমাল ঠেকিতেছে।"

২৪

সন্ধ্যা হইয়াছে। আত্রেয়ী কাশী রামকৃষ্ণ-সেবাশ্রমের একটি ক্ষুদ্র কক্ষে একাকিনী বসিয়া রহিয়াছেন। প্রতি মুহূর্ত্তে সুজাতার

আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। কিয়ৎক্ষণ পরেই পদশব্দ শুনিয়া চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার সম্মুখে গৈরিকবস্ত্রধারিণী এক রমণী দণ্ডায়মানা, তাঁর দক্ষিণ হস্তে একটি ত্রিশূল। এই গৈরিকবস্ত্রপরিহিতা রমণীকে দেখিবামাত্র আত্রেয়ী দাঁড়াইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন। এক একবার তাঁর মনে হইল যে, তিনি বোধ হয় স্বপ্ন দেখিতেছেন, নচেৎ ইন্দ্রলেখা ঠাকুরাণী ডাক্তার হরেন্দ্রনারায়ণের পত্নী কেমন করিয়া আত্রেয়ীর সম্মুখে আসিলেন। অথবা, গৈরিকবস্ত্রধারিণী সুজাতা ইন্দ্রলেখা নহেন, তাঁহার সহিত সুজাতার আকৃতিগত সাদৃশ্য আছে। আত্রেয়ীকে বেশীক্ষণ ভাবিতে হইল না। আগন্তুক রমণীই প্রথমে কথা কহিলেন। বলিলেন, "আপনি ত অধ্যাপক তারক রাওয়ের পত্নী আত্রেয়ী।"

আত্রেয়ী। হাঁ, আপনাকে দেখিয়া ইন্দ্রলেখা দিদি বলিয়া বোধ হইতেছে। আপনিই কি সুজাতা?

সুজাতা। হাঁ। আমার গৃহস্থাশ্রমের নাম ইন্দ্রলেখা ছিল।

আত্রেয়ী। বলেন কি! আপনি কি তবে গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসিনী হইয়াছেন?

সুজাতা। আমার বেশ দেখিয়াই তাহা বুঝিতে পারিতেছ।

আত্রেয়ী। আপনার গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসিনী হইবার কারণ কি জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?

সুজাতা। তাহা বলিতে আমার আপত্তি নাই। তবে সে কথা শুনিয়া তোমার মনে বোধ হয় কষ্ট হইবে।

আত্রেয়ী। তাহা হইলে সে কথা এখন না হয় নাই শুনিলাম। প্রণব স্বামীজি কি আপনাকে আমার নিকট পাঠাইয়াছেন?

সুজাতা। "হাঁ।" এই বলিয়া সুজাতা নিজে বসিয়া আত্রেয়ীকে বসিতে বলিলেন। আত্রেয়ী বসিলেন। সুজাতা বলিলেন, "তুমি তোমার স্বামীর উপর বিরক্ত হইয়া তাঁহার সংস্রব ত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিয়া এখানে আসিয়াছ।"

আত্রেয়ী। তাই বটে। স্বামীজি কেমন করিয়া তাহা জানিলেন।

সুজাতা। স্বামীজি লোকের মনের ভাব জানিতে পারেন। তিনি অন্তর্যামী।

আত্রেয়ী। বলেন কি?

সুজাতা। আর বলিব কি? তুমি ত নিজেই দেখিয়াছ। ছেলেবেলা হইতে সকল বিষয়ে য়ুরোপীয়দের মতে শিক্ষিত হইয়া ইংরেজী-শিক্ষিতদের অধিকাংশের এমন দশা হইয়াছে যে, আমরা পশ্চিম দিকেই মুখ করিয়া রাখিয়াছি। বিলাতী ছাপ না থাকিলে আমাদের কাছে কোন জিনিষেরই মূল্য হয় না। রত্ন ছাড়িয়া কাচের আদর আমাদের মত আর কেহ করে নাই।

আত্রেয়ী। ক্ষমা করিবেন। যত বুজরুগী সবই কি বিশ্বাস করিতে হইবে?

সুজাতা। তা কে বলিতেছে। কিন্তু বিলাতী পণ্ডিতেরা কোন ব্যাপার বিশ্বাস করেন না বলিয়াই যে আমরাও তা বিশ্বাস করি না—ইহাতেই আমার আপত্তি। য়ুরোপীয়েরা যোগশাস্ত্রের

কিছুই জানেন না। কাজেই যোগসিদ্ধ পুরুষদের ক্ষমতার বিষয় তাঁহাদের কোন ধারণাই থাকিতে পারে না। য়ুরোপীয়দের বিশেষতঃ ইংরেজদের মত এতই সঙ্কীর্ণ যে, তাঁরা ভাবেন তাঁরা যা জানেন না, অন্যে তাহা জানিতে পারে না।

আত্রেয়ী। আমার মনের বর্ত্তমান অবস্থা তর্ক করার অনুকূল নয়। তর্ক থাকুক। আমি অবিশ্বাসিনী নহি, তবে যেরূপ শিক্ষা পাইয়াছি, তাহাতে অনেক বিষয়েই সংশয়বাদিনী। স্বামীজিকে দেখিয়াই তাঁহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে। আমার প্রতি স্বামীজির কি আদেশ বলুন।

সুজাতা। স্বামীজি বলিয়াছেন, তুমি পুনরায় তোমার গৃহে ফিরিয়া গিয়া তোমার স্বামীর প্রকৃত সহধর্ম্মিনী হও। তাঁহার অধঃপতনের পথরোধ কর।

আত্রেয়ী। স্বামীজি বলিয়াছেন, আপনি আমার মনের সংশয় দূর করিবেন। স্বামীর নিকট পুনরায় ফিরিয়া যাওয়া সম্বন্ধে আমার মনে যে সংশয় জন্মিতেছে, আপনাকে তাহা জানাইতে ইচ্ছা করি।

সুজাতা। স্বচ্ছন্দে বল।

আত্রেয়ী। আমার সহিত আমার স্বামীর যে বিবাহ হইয়াছে তাহা বৈধ কিনা তাহাতে আমার সন্দেহ জন্মিয়াছে।

সুজাতা। তুমি কি বলিতেছ, বুঝিতে পারিতেছি না।

আত্রেয়ী। বুঝাইয়া বলিতেছি। আমি অকাট্য প্রমাণ পাইয়াছি যে, আমার স্বামী অথবা লোকে যাঁহাকে আমার স্বামী

বলিয়া জানে, তিনি আর এক রমণীকে বিবাহ করিয়াছেন। যদি সেই রমণীর সহিত তাঁহার পূর্ব্বেই বিবাহ হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমার সহিত তাঁহার বিবাহ কখনই বৈধ হইতে পারে না। আর যদি আমার সহিত বিবাহ হইবার পর তিনি সেই রমণীকে বিবাহ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সেই রমণীর সহিত তাঁহার বিবাহ বৈধ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। আমার সহিত যদি তাঁর বৈধ বিবাহ হইয়া থাকে, তাহা হইলে যে স্বামী বিবাহিতা পত্নীর প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা করিয়া অন্য রমণীর প্রণয়াসক্ত হইয়া পত্নীর প্রেমের অপমান করিয়াছে, তাহার সহিত আমি কোন সংস্রব রাখিতে ইচ্ছা করি না।

সুজাতা। কিন্তু যদি এমন হয় যে, তোমার স্বামীর উভয় বিবাহই বৈধ বিবাহ।

আত্রেয়ী। তা হইবে কেমন করিয়া? এক স্ত্রী বর্ত্তমানে কি কোন পুরুষ অন্য রমণীকে বিবাহ করিতে পারে?

সুজাতা। খৃষ্টানেরা পারে না, কিন্তু হিন্দু ও মুসলমানেরা তাহা পারে। যাঁহারা দীক্ষিত ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মবিবাহ আইন অনুসারে রেজেষ্টারী করিয়া বিবাহ করিয়াছেন, তাঁহারাও পারেন না। তোমার স্বামী হিন্দু। তিনি এক পত্নী বর্ত্তমানে অন্য রমণীর পাণিগ্রহণ করিতে পারিবেন না কেন?

আত্রেয়ী। আমার বাবা ব্রাহ্মমতাবলম্বী ছিলেন। হিন্দুমতে আমাদের বিবাহ হয় নাই।

সুজাতা। আমি সে বিবাহে উপস্থিত ছিলাম। সে বিবাহ

হিন্দুমতেই হইয়াছিল। তোমার পিতা দীক্ষিত ব্রাহ্ম ছিলেন না এবং ব্রাহ্মবিবাহ আইন অনুসারে রেজেষ্টারী করিয়াও তোমাদের বিবাহ হয় নাই।

আত্রেয়ী। আমার বাবা ত হিন্দুসমাজের কোন নিয়মই মানিতেন না। ব্রাহ্মসমাজের লোকদের সঙ্গে মিশিতেন।

সুজাতা। তাহাতে হিন্দুসমাজের লোকেরা তাঁহাকে একঘরে করিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাতে হিন্দুত্বের লোপ হয় নাই, হিন্দুত্ব অত সহজে যায় না।

আত্রেয়ী। এক স্ত্রী বর্ত্তমানে অন্য স্ত্রীকে বিবাহ করা অসভ্যতার চরম ও অন্যায়ের চূড়ান্ত। ইহাতে দুর্নীতির প্রশ্রয় দেওয়া হয়। এই সকল কারণেই হিন্দুদের এত অবনতি।

সুজাতা। তোমার এ সকল কথার উত্তর অন্য সময়ে দিব। আজ এ পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, হিন্দুদের মধ্যে যখন পুরুষের এক স্ত্রী বর্ত্তমানে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করার অধিকার আছে, তখন তোমার স্বামীর দুইটি বিবাহ হইয়াছে বলিয়া তাঁহার শেষবারের বিবাহ অসিদ্ধ হইতে পারে না। কুলীন ব্রাহ্মণদের মধ্যে এককালে বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল, প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্টায় এবং সাধারণ লোকের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার হওয়ায় আজকাল শিক্ষিত সমাজে বহুবিবাহ একপ্রকার উঠিয়াই গিয়াছে বলিলেই হয়। আজকাল কোন পুরুষ এক স্ত্রী বর্ত্তমানে দারান্তর গ্রহণ করিলে লোকে তাহার নিন্দা করে। আমি পুরুষের বহুবিবাহের পক্ষপাতী নই। আজকাল কেহই তা নয়। বহুবিবাহ বহু দোষের

আকর, কিন্তু তাই বলিয়া কোন হিন্দু পুরুষ যদি এক স্ত্রী বর্ত্তমানে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহার দ্বিতীয় বারের বিবাহ অসিদ্ধ হইবে না; তাহার দ্বিতীয় পত্নীর গর্ভজাত সন্তান বৈধ সন্তান গণ্য হইবে এবং তাহারা পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবে।

আত্রেয়ী। এই সকল আইনঘটিত কথা আপনি কেমন করিয়া জানিলেন?

সুজাতা। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এ বিষয় লইয়া বাদানুবাদ হইয়াছিল। খবরের কাগজে ও মাসিক পত্রে তা পাঠ করিয়া এবং এখানকার কয়েকজন পণ্ডিতের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া এ সম্বন্ধে কিছু জানিয়াছি।

আত্রেয়ী। আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা ঠিক হইলে আমার স্বামীর দুইটি বিবাহই আইন অনুসারে সিদ্ধ। কিন্তু আমার স্বামীর ন্যায় উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির নিকট আমি এরূপ ব্যবহার কখনই প্রত্যাশা করি নাই। আমাদের বিবাহ আমাদের অভিভাবকেরা স্থির করেন নাই। আমরা পরস্পরকে পূর্ব্বে ভালবাসিয়া তাহার পর পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছি। আমার স্বামী আমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া আর একটি বিবাহ করিয়াছেন। এরূপ বিশ্বাসঘাতকের সহিত আর কোন সংস্রব রাখিতে আমার ইচ্ছা হয় না। আশৈশব আমি যে ভাবে প্রতিপালিত ও শিক্ষিত হইয়াছি, তাহাতে স্বামীর এরূপ ব্যবহার সহ্য করা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি আমার স্বামীর সহিত বিবাহবন্ধন ছিন্ন করিয়া লোক-

সেবায় আত্মোৎসর্গ করিতে চাহি। তাহা হইলে আমার অশান্ত হৃদয় শান্ত হইতে পারে।

সুজাতা। মুসলমান ও খৃষ্টানদের মত হিন্দুদের বিবাহবন্ধন ছিন্ন করিবার উপায় নাই।

আত্রেয়ী। ইহা অত্যন্ত অন্যায়।

সুজাতা। অন্যায় হউক আর যাহাই হউক, ইহাই যখন হিন্দুশাস্ত্রের বিধান তখন তাহা মানিতেই হইবে।

আত্রেয়ী। আইন মতে আমাদের বন্ধন ছিন্ন না হউক, আমি আমার বিশ্বাসঘাতক স্বামীর সংস্রবে থাকিতে পারিব না।

সুজাতা। অত উত্তেজিত হইও না, যা বলি স্থির হইয়া শোন। তুমি তোমার স্বামীকে অবশ্যই ভালবাস।

আত্রেয়ী। আগে ভালবাসিতাম। এখন তাঁর প্রতি আমার ভালবাসা নাই।

সুজাতা। এটা অভিমানের কথা। যাকে ভালবাসা যায় তাকে ভালবাসি না বলিলেই ভালবাসার লোপ হয় না। তুমি এখনও তোমার স্বামীকে ভালবাস, তবে তাঁহার ব্যবহারে হৃদয়ে আঘাত পাইয়াছ। তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ কি কেবল দেনা পাওনার সম্বন্ধ? কেবলই দোকানদারী? তুমি যদি আমাকে ভালবাস, আদর যত্ন কর, তাহা হইলেই আমি তোমাকে ভালবাসিব, আর যদি তুমি আমাকে ভাল না বাস, আমাকে আদর যত্ন না কর, আমি তোমার সহিত সেইরূপ

ব্যবহার করিব। ইহাই কি তোমার মতে দাম্পত্য প্রেমের লক্ষণ? প্রকৃত ভালবাসার ধর্ম্ম কি?—

"ভালবাসিবে বলে ভালবাসিনে,
আমার এই স্বভাব তোমা বই আর জানিনে।"

আরও ভাবিয়া দেখ, পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে, অপরাধেরও ক্ষমা আছে। ভাবিয়া দেখ, স্বামীজি তোমাকে কি কথা বলিয়াছেন; তিনি প্রথমে বলিয়াছেন, "ভর্ত্তুর্বিপ্রকৃতাপি রোষণতয়া মাস্ম প্রতীপং গম।" পরে বলিয়াছেন,

"তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং
প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যং।
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়াহর্হসি দেব সোঢ়ুম্।"

স্বামীজি তোমাকে এরূপ ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, তুমি ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া তোমার স্বামীর বিরুদ্ধাচরণ করিও না এবং তোমার স্বামী তোমার প্রতি অন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকিলে তাঁহার অপরাধ মার্জ্জনা করিও। তুমি রক্ষা না করিলে, তোমার স্বামী অধঃপতনের শেষ সীমায় উপনীত হইবেন, তখন আর তাঁর উদ্ধারের উপায় থাকিবে না। তুমি তোমার স্বামীকে সুপথে আনিয়া প্রকৃত সহধর্ম্মিণীর কাজ কর। তোমার স্বামীর ভোগাভিলাষ অত্যন্ত প্রবল, কিন্তু জানই ত

"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি
হবিষাকৃষ্ণ বর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে।"

তুমি চেষ্টা করিলে তাঁহাকে সংযত করিতে পার। তোমার সপত্নীর সে জ্ঞান, ক্ষমতা নাই ; সে অত্যন্ত সরলা, সাংসারিক জ্ঞানশূন্যা।" আত্রেয়ীর সপত্নী সরলা, সাংসারিক জ্ঞানশূন্যা, সুজাতার মুখে এই কথা শুনিয়া আত্রেয়ীর বিস্ময়ের অবধি রহিল না। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার সপত্নী কে, তাহার স্বভাব কিরূপ, তাহা আপনি কিরূপে জানিলেন ?"

সুজাতা। আমি নিজে কিছুই জানি না। স্বামীজি যেরূপ আদেশ করিয়াছেন, তাহাই বলিতেছি।

আত্রেয়ী। স্বামীজি আমার সপত্নীর কথা কেমন করিয়া জানিলেন ?

সুজাতা। পূর্ব্বেই ত বলিয়াছি স্বামীজি অন্তর্যামী। সে কথা বিজয়ানন্দ স্বামীও তোমাকে বলিয়াছেন।

আত্রেয়ী চুপ করিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ সুজাতাও আর কোন কথা বলিলেন না। অবশেষে আত্রেয়ী বলিলেন, "আজ প্রাতঃকালে আমি যখন প্রণব স্বামীর নিকট যাই তখন তিনি আমাকে লক্ষ্য করিয়া যে শ্লোক দুইটি বলিয়াছিলেন, তাহাতে আমারও এইরূপ মনে হইয়াছিল যে, তিনি আমাকে স্বামীর বিরুদ্ধাচরণ করিতে নিষেধ করিতেছেন এবং স্বামীর অপরাধ ক্ষমা করিতে বলিতেছেন।"

সুজাতা। তুমি সংস্কৃত ভাষায় সুশিক্ষিতা বলিয়াই স্বামীজি অভিজ্ঞান শকুন্তলার এবং শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতার শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তোমাকে উপদেশ দিয়াছিলেন। এখন তুমি কি করিবে স্থির করিতে পারিয়াছ কিনা ?

আত্রেয়ী। আজ রাত্রিটা আমাকে ভাবিবার সময় দিন।

সুজাতা বিদায় হইলেন।

২৫

রাত্রে শুইয়া আত্রেয়ী ভাবিতে লাগিলেন। "ফিরিয়া যাওয়া উচিত কিনা। যাওয়াই বোধ হয় কর্ত্তব্য। আসিবার সময় ঝি চাকরদের বলিয়া আসিয়াছি বিশেষ কার্য্যবশতঃ কাশী যাইতেছি; দু' এক দিনের মধ্যে ফিরিয়া গেলে তারা কিছু মনে করিতে পারিবে না। কিন্তু ইন্দ্রলেখা বা সুজাতা আইনঘটিত যে সকল কথা বলিলেন, তাহা ঠিক কিনা তাহার পরখ করিয়া লইতে হইবে। ইন্দ্রলেখা সন্ন্যাসিনী হইলেন কেন তাহাও জানিতে হইবে।" তাহার পরদিন সামান্ত অনুসন্ধানেই আত্রেয়ী ইন্দ্রলেখার সন্ন্যাস অবলম্বনের কারণ জানিতে পারিলেন। একমাসের মধ্যে ইন্দ্রলেখার স্বামী ও পুত্র দুইটির অকস্মাৎ মৃত্যু হওয়ায় ইন্দ্রলেখার মনে সংসারের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মে। তাই তিনি সন্ন্যাসিনী হইয়াছেন।

ইন্দ্রলেখার অবস্থা-বিপর্য্যয়ের কথা শুনিয়া আত্রেয়ীর মনেও কেমন যেন নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল।

দুই দিবস পরে আত্রেয়ী দক্ষিণপাড়ায় ফিরিয়া গিয়া দেখিলেন, তারকের একখান চিঠি তার পূর্ব্বদিন আসিয়াছে, সেই চিঠি পড়িয়া আত্রেয়ী জানিতে পারিলেন, তার পরদিনই তারক দক্ষিণপাড়ায় আসিতেছেন। আত্রেয়ীর মনে হইল, তারক এত শীঘ্র না ফিরিলেই যেন ভাল হইত। আত্রেয়ীর ভাবনা হইল, এখন সে তার

স্বামীর সহিত কেমন ব্যবহার করিবে। স্বামী কাশী যাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেই বা কি বলিবে। কথায় বা কার্য্যে ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে আত্রেয়ী অভ্যস্ত ছিলেন না। সুধীরার সহিত ব্যবহারে এ বিষয়ে আত্রেয়ীর হাতেখড়ি হইয়াছিল। ভাবিলেন, স্বামী কাশী যাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিবেন যে, সেবাশ্রমের কার্য্যপ্রণালী দেখিতে গিয়াছিলেন। সে কথা বলিলে আত্রেয়ীর কাশী গমনের প্রকৃত উদ্দেশ্য বলা না হইলেও মিথ্যাকথা বলা হইবে না। এমনই করিয়া আত্রেয়ী মনকে চোখ ঠারিলেন। ভাবিলেন, যদি তেমন সময় আইসে, স্বামীকে সকল কথাই খুলিয়া বলিবেন।

যথাসময়ে তারক ফিরিয়া আসিলেন। তারক স্বাস্থ্যকর স্থান হইতে আসিতেছেন, তথাপি যেন কেমন একটু রোগা হইয়া গিয়াছেন। এবার আত্রেয়ী তারককে পূর্ব্বাপেক্ষা আদর যত্ন করিলেন। তারক সেদিন বাড়ী হইতে আর কোথাও গেলেন না। আরও কয়েকদিন তাঁর ছুটি ছিল। শনিবার বৈকালে জলযোগের পর তারক আত্রেয়ীকে বলিলেন, "আজ কলিকাতায় চলিলাম, বোধ হয় আজ আর ফিরিতে পারিব না। যদি দরকার বোধ করি, রবিবারটাও কলিকাতায় কাটাইতে পারি। হয় রবিবার বৈকালের ট্রেণে, নয় সোমবার প্রাতঃকালে এখানে ফিরিব।" আত্রেয়ী বুঝিলেন, তারক সুধীরার সন্ধানে যাইবেন। তাঁর মনে হইল, আর লুকোচুরি না করিয়া তারকের নিকট সুধীরা সংক্রান্ত ব্যাপার প্রকাশ করিয়া দেন। অতি কষ্টে মনের এই ভাব দমন

করিলেন। তারক হাসিমুখে আত্রেয়ীর নিকট বিদায় লইয়া ষ্টেশন অভিমুখে চলিয়া গেলেন।

আত্রেয়ী বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

২৬

তারক ষ্টেশনে আসিয়া টিকিট করিয়া প্ল্যাট্‌ফর্ম্মে বেড়াইতেছেন, এমন সময়ে একজন খবরের কাগজের ফিরিওয়ালাকে দেখিয়া তাহাকে কাছে ডাকিয়া তাহার কাছে কি কাগজ আছে দেখিতে চাহিলেন। দেখিলেন, তাহার কাছে কয়েকখানি বাংলা সাপ্তাহিক কাগজ মাত্র রহিয়াছে। একখানি কাগজ কিনিলেন। এমন সময় ট্রেণ আসিল। তারক কাগজখানি হাতে করিয়া ট্রেণে উঠিয়া বসিয়া কাগজখানি পড়িবার চেষ্টা করিলেন। সেই কাগজখানিতে মোগলসরাই ষ্টেশনে আত্রেয়ী সংক্রান্ত ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ ছিল। ইতিপূর্ব্বে কাজের চাপে তারক খবরের কাগজ পড়িবার অবসর পান নাই। মোগলসরাই ষ্টেশনঘটিত বিবরণ পাঠ করিয়া তারক বুঝিলেন, তাঁহার অনুপস্থিতিকালে আত্রেয়ী কাশী গিয়া দুইদিন রামকৃষ্ণ-সেবাশ্রমে ছিলেন, অথচ তারককে সে সম্বন্ধে কোন কথাই বলেন নাই। তারক ভাবিতে লাগিলেন, ইহার কারণ কি? আত্রেয়ী কি জন্ত কাশী গিয়াছিলেন? আর যদিই বা গেলেন, এত বড় ঘটনা ঘটিয়া গেল, অথচ আমাকে সে কথা জানাইলেন না! এটা কেমন হইল! সঙ্কোচ বশতঃই কি এ ঘটনা আমাকে জানান নাই! না, তা বোধ হয় না। ইহাতে সঙ্কোচের

কিছুই নাই। বরং আমি আসিবামাত্র আমার কাছে নবীন মজুমদার মহাশয়ের শতমুখে প্রশংসা করাই আত্রেয়ীর পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। নবীন মজুমদার মহাশয়কে জানিতে দেওয়া হইবে না যে, আত্রেয়ী আমাকে মোগলসরাই-সংক্রান্ত ঘটনার কথা বলেন নাই। তাহা হইলে নবীন মজুমদার মহাশয় কি মনে করিবেন। বরং আমি তাঁর সঙ্গে দেখা হইলে নীচমনা ইংরাজটাকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার জন্য ও আত্রেয়ীকে বিপদ্ হইতে রক্ষা করার জন্য তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া তাঁকে ধন্যবাদ দিব। আত্রেয়ী আমাকে না জানাইয়া কাশী গেলেন, পথিমধ্যে এত বড় একটা ঘটনা হইয়া গেল, অথচ আমাকে তাহা জানাইলেন না, ইহার কারণ আমাকে বাহির করিতেই হইবে। খবরের কাগজে আমি ঐ বিবরণ পাঠ করিয়া থাকিতে পারি ভাবিয়াই কি আমাকে তা জানান আবশ্যক মনে করেন নাই! না, তা হইতে পারে না। আমার সঙ্গে তাঁর সে সম্বন্ধে কোনরূপ প্রসঙ্গ না করাটা আমার কাছে কেমন অস্বাভাবিক ঠেকিতেছে। লিলুয়া ষ্টেশনে নামিব, না বরাবর কলিকাতা যাইব, রাত্রির ট্রেণে লিলুয়া ফিরিয়া আসিব! না, কাজ নাই, কলিকাতায় আজ আর যাইব না!, সেখানে গেলেই নানা কাজে জড়াইয়া পড়িব। কয়েকদিন সুধীয়ার আর ছেলে দুইটির কোন খবর পাই নাই। আজ তাহাদের দেখিতেই যাই। সোমবারে কলিকাতা গেলেই চলিবে।

যথাসময়ে ট্রেণ লিলুয়া ষ্টেশনে পৌছিল। তারক ট্রেণ হইতে

নামিয়া নয়াবাজার অভিমুখে চলিলেন। সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই সুখীয়ার বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, দুয়ার ভিতর হইতে বন্ধ, কড়া ধরিয়া নাড়িলেন। টহলার মা বলিল, "কে ?" তারক বলিলেন, "দুয়ার খুলিয়া দাও।" সে কথা টহলার মার কর্ণকুহরে প্রবেশ না করিলেও সুখীয়া তা শুনিয়া তাড়াতাড়ি আসিয়া দুয়ার খুলিয়া দিল। তারক বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিয়া দুয়ার বন্ধ করিয়া সুখীয়ার হাত ধরিয়া সেই সুসজ্জিত কক্ষে প্রবেশ করিয়া টেবিলের সম্মুখস্থিত চেয়ারে বসিলেন। হাব্‌লা কলরব করিতে করিতে তারকের কোলে উঠিয়া বসিয়া তাঁর ঘড়ি ধরিয়া টানাটানি আরম্ভ করিল। তারক হাব্‌লার সহিত খানিকক্ষণ খেলা করিয়া পকেট হইতে কয়েকটি সুন্দর খেলানা বাহির করিয়া হাব্‌লার হাতে দিলেন। খেলনা পাইয়া হাব্‌লা খুসী হইয়া বাবার কোল হইতে নামিয়া পড়িয়া সেগুলি টহলার মাকে দেখাইতে ছুটিল। তখন তারক ছোট ছেলেটিকে কোলে করিলেন। সুখীয়া অন্য ঘরে চলিয়া গিয়া কয়েক মিনিট পরে একবাটা পান আনিয়া তারকের সম্মুখে রাখিয়া চেয়ারের হাতা ধরিয়া তারকের পাশে দাঁড়াইয়া অতৃপ্তনয়নে তারককে দেখিতে লাগিল।

সুখীয়ার সহিত কথা কহিতে কহিতে টেবিলের এক পাশে তারকের নামলেখা একখানি খামে তারকের দৃষ্টি পড়িল। তারক খামখানি হাতে তুলিয়া লইয়া বলিলেন, "এ খাম এখানে আসিল কেমন করিয়া ? তুমি কি আমার কাছে পাঠাইবার জন্য এ খাম বাক্স হইতে বাহির করিয়াছিলে ?" এমন সময় হাব্‌লা সেখানে

আসিয়া তারকের হাতে খামখানি দেখিয়া সুখীয়া কোন কথা বলার পূর্ব্বেই বলিল, “ওতা মাচি মাকে দিয়েছে।” তারক বিস্মিত হইয়া সুখীয়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “হাব্‌লা কি বলিতেছে? ওর মাসী কে হইল? টহ্‌লার মা না কি?” সুখীয়া চুপ করিয়া রহিল। হাব্‌লা বলিল, “বাবা, মাচি দেখ্‌তে খুব ভালো, আমাকে কত খাবার দেয়, কোলে করে, চুমো খায়।” তারকের বিস্ময়ের মাত্রা বৃদ্ধি পাইল। তিনি দৃঢ়স্বরে সুখীয়াকে বলিলেন, “এ কি বলিতেছে? এর মাসী কে? অন্য কোন লোক কি এখানে আসিয়াছিল?” তখন সুখীয়া সংক্ষেপে আত্রেয়ীর সহিত প্রথম দিনের সাক্ষাতের কথা বলিল। আত্রেয়ীর আকৃতির যতদূর পারিল বর্ণনা করিল। শুনিয়া তারক ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া মেয়েটীর নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। সুখীয়া বলিল, “তা ত জানি না। তাঁর নাম জিজ্ঞাসা ক’রতে ভুলে গিয়েছিলাম, তিনি বড় ভাল লোক। কেমন মিষ্টি মিষ্টি কথাগুলি, ভাগো তিনি সেদিন হাব্‌লাকে দেখ্‌তে পেয়ে সঙ্গে ক’রে বাড়ীতে রেখে গিয়েছিলেন, নৈলে কি হ’ত বল ত? ভাব্‌তে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। আমি টহ্‌লার মার মুখে শুনেছি, তিনি গরীবদের জন্যে অনেক পয়সা খরচ করেন।”

তারক বলিলেন, “তা ত বুঝ্‌লাম, কিন্তু এ খামখানি তিনি কেমন করিয়া তোমাকে দিলেন, তা বুঝিতে পারিতেছি না।”

সুখীয়া বলিল, “বাঃ রে, তিনি কেন ও খাম আমার হাতে দিতে যাবেন। আমিই ওঁর হাতে খামখানি দিয়েছিলাম।”

তারক। তুমি কেন ওঁর হাতে খাম দিতে গেলে?

সুধীরা। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, তোমার স্বামীর নাম কি? আমি বল্লাম, স্বামীর নাম বল্‌তে নাই! তাতে তিনি বল্লেন যে লিখে দেখিয়ে দাও। আমি বল্লাম যে আমার ওসব পাঠ নাই। লেখাপড়ার হাঙ্গামে আমি যাই না। তোমার নামলেখা খাম আমার কাছে আছে মনে পড়ায় এই খামখানি বাক্স হ'তে এনে তাঁর হাতে দিয়ে বলি যে, এই খামের ওপর যা লেখা আছে, তাই আমার স্বামীর নাম।

তারক। খামের ওপর আমার নাম ত ইংরেজীতে লেখা রয়েছে। তা তিনি পড়্‌তে পেরেছিলেন? খাম দেখে তিনি তোমাকে আর কিছু বলেছিলেন?

সুধীরা। সে এক মজা হ'য়েছিল। খামখানি আমি তাঁর হাতে যাই দিয়েছি, অমনি তাঁর যে কাঁপুনি। কাঁপতে কাঁপতে তিনি প'ড়ে যান দেখে আমি তাঁকে ধ'রে এই বিছানায় শুইয়ে মুখে মাথায় জল দিয়ে বাতাস কর্‌লে তবে তাঁর হুঁস হয়। তার পর একটু জলটল খেয়ে সুস্থ হ'য়ে বাড়ী গেলেন।

তারকের বিস্ময়ের মাত্রা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিনি সুধীরাকে উদাসীনভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও রকম হ'ল কেন বল্‌তে পার?"

সুধীরা বলিল, "বোধ হয় মূর্চ্ছার ব্যারাম আছে। তিনি বলেছিলেন, বেশী খাটুনীর জন্যে ও রকম হ'য়েছিল।"

তারক জিজ্ঞাসা করিলেন, "তা যেন হ'ল। হাব্‌লা ওঁকে মাসী বলছে কেন?"

সুখীয়া। ওঁকে দেখবামাত্র আমার কেমন ভাল লাগ্‌ল। ওঁকে দিদি বল্‌তে ইচ্ছা হ'ল। তাই হাব্‌লাকে বল্লাম, "ওই দেখ্ তোর মাসী।" হাব্‌লা অমনি "মাচি, মাচি" ব'লে তাঁর কোলে উঠ্‌লো। তিনি হাব্‌লাকে কত আদর কর্‌লেন।

তারক বলিলেন, "সুখীয়া, অচেনা, অজানা লোককে বাড়ীতে ঢুক্‌তে দিয়ে তুমি ভাল করনি।"

সুখীয়া। তাঁকে বাড়ীতে ঢুক্‌তে না দিলে হাব্‌লাকে কে রাস্তা হ'তে এনে দিত?

তারক। যা বলি শোন। হাব্‌লাকে সাবধানে রেখো। সে যেন বাড়ীর বাইরে যেতে না পারে। অনেক মায়াবিনী ভালমানুষ সেজে বেড়ায়। তারা মানুষের ভারী অনিষ্ট করে। তুমি যাকে দিদি বল্‌ছ, তিনি যে একজন মায়াবিনী নন তা' বলা যায় না। আর অচেনা, অজানা কাউকে এ বাড়ীতে ঢুকতে দিও না, তা হ'লে তোমার ছেলেদের, আমার, তোমার, আমাদের সকলেরই বিপদ্ ঘট্‌তে পারে।

সুখীয়া ভীত হইয়া বলিল, "না, না, আমি আর কাউকে এ বাড়ীতে ঢুক্‌তে দেব না। টহলার মা যদি সেদিন অসাবধান হ'য়ে দুয়ার খুলে না রাখ্‌ত, তা হ'লে হাব্‌লা বাড়ীর বাহিরে যেতে পারত না। তুমি টহলার মাকে বেশ ভাল ক'রে ব'লে যাও। ও আমাকে মান্‌তে চায় না। অচেনা, অজানা লোককে বাড়ীতে ঢুক্‌তে দেব না, কিন্তু সেই দিদি যদি আবার আসেন ত কি করব? চুপ ক'রে থাক্‌বো, না বল্‌বো যে আপনার সঙ্গে দেখা কর্‌তে পার্‌বো না, আপনি চ'লে যান। আমি তা কর্‌তে পার্‌ব না।

তারক। তুমি তাঁর ডাকে সাড়া দিও না। চুপ ক'রে থেক। তিনি ডেকে ডেকে কোন উত্তর না পেলে আপনিই চ'লে যাবেন।

সুখীয়া বলিল, "তা কিন্তু ভারী খারাপ দেখাবে।"

তারক গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "না, কিছুমাত্র খারাপ দেখাবে না। তিনি আমাদের সাত পুরুষের কুটুম নন। এখন সে সব কথা ছেড়ে দাও। আজ রাত্রে কি খাওয়াবে বল দেখি ?"

সুধীরা। কি খাবে ? মাংস ?—ডিম, পোলাও ?—

তারক। না, না, ওসবে কাজ নাই। এ কয়দিন পাহাড়ে মুলুকে মাংস খেয়ে খেয়ে মাংসে অরুচি ধ'রে গিয়েছে। আজ রাত্রে খাঁটি সাত্ত্বিক আহার করতে চাই।

সুধীরা হাসিয়া বলিল, "সে আবার কি ?"

তারক বলিলেন, "তা যে কি, বলি শুনে যাও। আজ রাত্রে চাই কয়েকখানি লুচী, বুটের দাল, আলুর দম, বেগুন ভাজা, একটু চাটনী, খানিকটা দুধ, কয়েকটা সন্দেশ, দু' গেলাস ঠাণ্ডা জল, পাঁচটা মশলাদার পান। কেমন দিতে পারবে ত ?"

সুধীরা হাসিয়া বলিল, "তা পারব বোধ হয়, কিন্তু পান পাঁচটা দিতে পারব না।"

তারক। কটা দেবে।—

সুধীরা হাসিয়া বলিল, "য'টা চাও।"

তারক সুধীরার চিবুকে অঙ্গুলীর দ্বারা টোকা মারিয়া বলিলেন, "একটুখানি বুদ্ধি হ'য়েছে দেখতে পাচ্চি।"

সুধীরা হাসিয়া তারকের আহারের আয়োজন করিতে গেল। তারক ভাবিতে লাগিলেন, সুধীরার দিদি ব্যক্তিটি কে ? যিনিই হউন না কেন, তাঁর সঙ্গে সুধীরার আর যাতে সাক্ষাৎ না হয়, তা করিতে হইবে। এ বাড়ীতে আর সুধীরাকে রাখা হইবে না। খিদিরপুরে একটা সুবিধামত বাড়ী ঠিক করিয়া সুধীরাকে সেই বাড়ীতে শীঘ্রই লইয়া যাইতে হইবে।

রবিবার প্রাতঃকালে সাড়ে দশটার ট্রেণে তারক কলিকাতা গেলেন। সুধীরাকে বলিয়া গেলেন, রাত্রি আটটার সময় এখানে ফিরিয়া আসিবেন। কলিকাতায় গিয়া নবীন মজুমদারের সহিত

সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে মোগলসরাইয়ের ঘটনা উপলক্ষে ধন্যবাদ দিয়া, তাঁহার বাসায় মধ্যাহ্ন ভোজন করিয়া অপরাহ্নে তাঁহার এক বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ী ভাড়া করিলেন। গাড়ীখানি বিডন ষ্ট্রীটের মোড় ফিরিয়া খানিকটা গিয়াছে, এমন সময় তারক দেখিলেন, ডাহিন ধারের নয়ানচাঁদ দত্তের ষ্ট্রীটে প্রবেশ করিবার মোড়ে এক ন্যাড়ামাথা তিলকধারী বৈরাগীর নিকট দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন বরদাকান্ত রাও। সেই সময় গাড়োয়ান গাড়ী থামাইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছিল, "আরও কতদুর যাইতে হইবে?" বৈরাগীর সহিত বরদাকান্তকে কথা কহিতে দেখিয়া তারকের সর্ব্বাঙ্গ যেন হিম হইয়া গেল। তিনি দুই হস্ত দ্বারা চক্ষু মার্জ্জনা করিয়া ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলেন। ঐ ব্যক্তি বরদাকান্ত ব্যতীত অপর কেহ নহে।

কি ভয়ানক! বরদাকান্ত ত মরিয়াছিল। তারককে যন্ত্রণা দিবার নিমিত্ত কি মৃত বরদাকান্ত আবার জীবিত হইল! অথবা ওটা বরদাকান্ত রাওয়ের প্রেতাত্মা, তারককে তাহার পাপের শাস্তি দিবার জন্য তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘুরিতেছে! তারক রাওয়ের বাক্‌শক্তি লোপ পাইবার উপক্রম হইল। কোন রকমে আত্মসংবরণ করিয়া লইয়া গাড়োয়ানকে গাড়ী চালাইতে বলিলেন। বিডন উদ্যানের নিকট গাড়ী হইতে নামিয়া গাড়োয়ানকে ভাড়া চুকাইয়া দিয়া বন্ধুর সহিত দেখা করিতে যাইবার জন্য দু'এক পা অগ্রসর হইয়া স্থির করিলেন আর সেখানে যাইবেন না, একবারে হাওড়া ষ্টেশনে গিয়া সেখান হইতে লিলুয়া ফিরিয়া যাইবেন। তখনই আর একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া হাওড়া ষ্টেশনে গিয়া লিলুয়া যাত্রী গাড়ীর আধ ঘণ্টা দেরী আছে দেখিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের বিশ্রামাগারে বসিয়া খবরের কাগজ পাঠ করিতে লাগিলেন, কিন্তু পড়িয়া কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, তখন তাঁর মাথা কেমন ঘুলাইয়া গিয়াছে।

২৭

তারক যে ব্যক্তিকে দেখিয়া মৃত বরদাকান্ত জীবিত হইল কেমন করিয়া ভাবিয়া ভয় পাইয়াছিলেন সে ব্যক্তি কে? সে ব্যক্তি বরদাকান্ত রাও। বরদাকান্ত রাও মরেন নাই। যেদিন তারক হাসপাতালে গিয়া শুনিলেন যে বরদাকান্ত মরিয়াছে, সেই দিন প্রত্যূষে বরদাকান্ত রাওয়ের পাগলামি হঠাৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং তিনি সেই ঝোঁকে অন্যের অলক্ষিতে হাসপাতাল হইতে পলায়ন করেন। তিনি যে খাটিয়ায় শুইতেন সেই খাটিয়ার পার্শ্বের খাটিয়ার রোগীটি রাত্রে মারা যায়। সেই খাটিয়া আর একজন নূতন রোগী কর্তৃক অধিকৃত হয়। তারককে যে ব্যক্তি বরদা রাওয়ের মৃত্যুসংবাদ দেয়, সে এইমাত্র জানিত যে ঐ ঘরে একটি রোগী মারা গিয়াছে। বরদাকান্ত রাওয়ের খাটিয়া খালি দেখিয়া সে ভাবিয়াছিল, ঐ খাটিয়ার রোগী মারা গিয়াছে। তাই সে তারককে ঐ কথা বলিয়াছিল। খাটিয়া খালি দেখিয়া এবং একজনের মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া তারকের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে বরদাকান্ত মরিয়াছেন, তারকের হাড়ে বাতাস লাগিয়াছে।

বরদাকান্ত হাসপাতাল হইতে বাহির হইয়া বরাবর উত্তরমুখে চলিলেন। বারানসী ঘোষের ষ্ট্রীটের নিকট আসিয়া কতকদূর বারানসী ঘোষের ষ্ট্রীট্ ধরিয়া চলিয়া সিমলা ষ্ট্রীটে প্রবেশ করিয়া চলিতে চলিতে মধুরায়ের গলির নিকটে আসিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। বরদাকান্ত এক আখড়ার সম্মুখে মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন। সেই সময় সে স্থানে সেই আখড়ার কৃষ্ণদাস বাবাজী দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি বরদাকান্তকে মূর্চ্ছিত হইতে দেখিয়া তাড়াতাড়ি তাঁহার নিকটে গিয়া তাঁহাকে কোলে করিয়া তুলিয়া আনিয়া আখড়ার একটি কক্ষে শয়ন করাইয়া তৎক্ষণাৎ একজন চিকিৎসককে ডাকিয়া আনিবার জন্য আর একজনকে পাঠাইয়া দিয়া নিজে মূর্চ্ছিত ব্যক্তির শুশ্রূষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে একজন ডাক্তার আসিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া গেলেন। দুই দিবস পরে বরদাকান্তের মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল। মূর্চ্ছাভঙ্গের পর তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁর মাথা তখন বেশ পরিষ্কার হইয়াছে। তিনি উঠিতে চেষ্টা করিলেন, দুর্ব্বলতা বশতঃ উঠিতে পারিলেন না। কৃষ্ণদাস বাবাজী রোগীর নিকট গিয়া বলিলেন, "আপনি এখন উঠিবার চেষ্টা করিবেন না, ডাক্তারের নিষেধ আছে। এখানে আপনি যতদিন ইচ্ছা থাকিতে পারিবেন। আপনার যাহাতে কোনরূপ কষ্ট না হয়, আমরা তার যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।" ইহা শুনিয়া বরদাকান্ত রাও কাঁদিয়া ফেলিলেন, তাঁর মনে হইল, আমি যাকে পুত্রাধিক স্নেহে পালন করিয়াছি, সে ব্যক্তি আমাকে চিনিয়াও আমাকে পাগল বলিয়া প্রচার করিয়া ফাটক দিল, অথচ সে আমার রত্নগুলি আত্মসাৎ করিয়া সুখের সাগরে ভাসিতেছে। আর এরা আমার কেউ নয়, অথচ এরা কত কষ্ট স্বীকার করিয়া আমার সেবা করিয়াছে, কিসে আমার কোনরূপ অসুবিধা না হয় সেদিকে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতেছে। ইহাতে ইহাদের কি স্বার্থ আছে? কৈ, কিছুই ত নাই। নিঃস্বার্থভাবে কি কেহ অপরের উপকার করে? আমার বিশ্বাস ছিল, স্বার্থের সংস্রব না থাকিলে একজন অপরের জন্য কিছুই করে না। যে কাজ স্থূল দৃষ্টিতে নিঃস্বার্থ বলিয়া মনে হয়, একটু তলাইয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়, তাহা স্বার্থপরতার নামান্তর মাত্র। এই বাবাজীদের ত আমাকে সাহায্য করার কোন স্বার্থ দেখিতেছি না। আমাকে তাহারা বড়লোক ঠাওরাইয়াছে নাকি? না তা মনে করিতে পারে না, আমাকে এখন দেখিয়া অতি দীনদুঃখী ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। তবে ইহারা আমার উপকার করে কেন? আছে, কারণ আছে। আমি ভাল হইয়া লোকের কাছে ইহাদের কার্য্যের সুখ্যাতি করিব, এ ক্ষেত্রে ইহাদের তাহাই লাভ!

না, এ কথা মনে করিতে নাই। আমার মন অতি সঙ্কীর্ণ, চিরকাল নিজের স্বার্থের কথাই ভাবিয়াছি, তাই অপরে নিঃস্বার্থভাবে কোন কাজ করিলেও তাহা বুঝিতে পারি না। কিন্তু তারকটাকে আমি খাওয়াইয়া পরাইয়া এত বড় করিলাম, তাকে লেখাপড়া শিখাইলাম, আমার জন্যই তার আজকাল এত সম্মান, এত প্রতিপত্তি, আর সে বলে কিনা আমি তার পিতা বরদাকান্ত নই, আমি পাগল! এত অকৃতজ্ঞ সে! সেক্সপীয়ারের অঙ্কিত গণরিলের চিত্র আমি অতিরঞ্জিত মনে করিতাম। এখন দেখিতেছি, তা ত নয়। সেই লোকচরিত্রজ্ঞ মহাকবি ত ঠিকই অঙ্কিত করিয়াছেন, বড় দুঃখেই তিনি লিয়রের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন,—

Ingratitude, thou marble-hearted fiend,
More hideous when thou showest thee in a child
Than the sea-monster.

নাঃ, আর মাথা মুণ্ডু ভাবিতে পারি না। ঘুম পাইতেছে, একটু ঘুমাইয়া লই। বরদাকান্ত ঘুমাইয়া পড়িলেন।

এই আখড়ায় প্রায় পনের দিন থাকিয়া বরদাকান্ত অনেকটা সুস্থ হইলেন, কিন্তু তখনও তাঁর ত্রিশ চল্লিশ হাতের অধিকদূর হাঁটিয়া যাইবার শক্তি হইল না। কৃষ্ণদাস বাবাজী বলিলেন, "রাও মহাশয়, আপনি যতদিন সম্পূর্ণ সুস্থ না হইবেন ততদিন এখানেই থাকিবেন। প্রতিদিন চারিটি করিয়া প্রসাদ পাইবেন, আর প্রভুর নাম করিবেন।" বরদাকান্ত রাওয়ের ওসব পাট ছিল না। তিনি বুঝিতেন, পৃথিবী ভোগক্ষেত্র। যতদিন দুনিয়াতে থাকি, "হেসে খেলে নাওরে যাদু, মনের সুখে।" সুতরাং কৃষ্ণদাস বাবাজীর মুখে হরি নাম শুনিয়া রাওমহাশয় কখন কখন বিরক্ত হইতেন কখন বা হাসিতেন। মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে সাহস করিতেন না।

কয়েকদিবস পরে কৃষ্ণদাস বাবাজী বরদাকান্তকে সঙ্গে করিয়া পার্শ্বের বাড়ীতে কথকতা শুনিতে গেলেন। তখন রাত্রি অনুমান

সাড়ে সাতটা। তাঁহারা গিয়া দেখিলেন, কিছুক্ষণ পূর্ব্বেই কথকতা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। সেদিন কথকতার বিষয় ছিল প্রহ্লাদ-চরিত্র। কথক মহাশয় বাংলা ভাষায় কথা বলিতেছিলেন, মধ্যে মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবৎ, বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি হইতে সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করিতেছিলেন এবং কখন বা স্বরচিত কখন বা অন্যের রচিত গান গাহিতেছিলেন। গায়ক সুকণ্ঠ। তাঁহার উচ্চারণ সুস্পষ্ট। বরদাকান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও কৃষ্ণদাস বাবাজীর অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া কথকতা শুনিতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু কথকের বলিবার ভঙ্গিটি এমনই হৃদয়গ্রাহিণী যে অল্পে অল্পে তিনি সেদিকে আকৃষ্ট হইলেন। প্রথমতঃ, তাঁহার কাছে হিরণ্যকশিপুর কার্য্য-কলাপগুলি ভাল লাগিল, কিন্তু কথক যতই অগ্রসর হইতে লাগিলেন ততই প্রহ্লাদের ভক্তিভাব বরদাকান্তের ন্যায় সংশয়-বাদীকেও মুগ্ধ করিল। বরদাকান্ত যে প্রহ্লাদচরিত্রের আখ্যান-বস্তু জানিতেন না এমন নয়। কিন্তু বাল্যকালে সেই যা কাশীদাসী মহাভারতে প্রহ্লাদচরিত্র পাঠ করিয়াছিলেন, তারপর ও বিষয়ের আর কোন আলোচনাই করেন নাই। আজ বহুকাল পরে কথকের মুখে সেই সকল কথা শুনিয়া বাল্যকালের সুখের স্মৃতি তাঁর মনে পড়িল। কথক মহাশয় বলিতেছিলেন, "হিরণ্যকশিপুর পুরোহিতেরা তাঁর আদেশক্রমে প্রহ্লাদকে বধ করিবার জন্য এক কৃত্যা উৎপাদন করিলেন। সেই কৃত্যা প্রকাণ্ড শূলের দ্বারা প্রহ্লাদের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিল, কিন্তু সেই ভীষণ শূল প্রহ্লাদের বক্ষে ঠেকিয়া, খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল।

'যত্রানপায়ী ভগবান্ হৃদ্যাস্তে হরিরীশ্বরঃ।
ভঙ্গো ভবতি বজ্রস্য তত্র শূলস্য কা কথা॥'

অর্থাৎ অনপায়ী ঈশ্বর ভগবান্ হরি যে হৃদয়ে রহিয়াছেন, তথায় বজ্রও ভাঙ্গিয়া যায়, শূল যে ভাঙ্গিয়া যাইবে তাহাতে আর কথা কি? সেই কৃত্যা তখন সেই সকল পাপিষ্ঠ পুরোহিতদিগকে

সংহার করিয়া স্বয়ং বিনাশপ্রাপ্ত হইল। দুরাত্মা পুরোহিতদিগকে তাহাদের দুষ্কর্ম্মের ফলভোগ করিতে দেখিয়া প্রহ্লাদ হৃষ্ট হইলেন না। পুরোহিতদের জন্য প্রহ্লাদের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তিনি পুরোহিতদিগকে বাঁচাইয়া দিবার জন্য ভগবানের স্তুতি করিলেন। এই প্রসঙ্গে কথক মহাশয় প্রথমে বিষ্ণুপুরাণের কয়েকটি শ্লোক পাঠ করিয়া পরে তাহার বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া ক্ষমার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলেন।

২৮

বরদাকান্ত আখড়ায় ফিরিয়া গিয়া শুইয়া শুইয়া দৈত্য পুরোহিতদিগকে বাঁচাইবার জন্য প্রহ্লাদের ব্যাকুলতার কথাই ভাবিতে লাগিলেন। একবার ভাবিলেন, সত্য ঘটনা কখনও এইরূপ হইতে পারে না। পুরাণে এইরূপ অনেক আজগুবী কথা লেখা আছে। অশিক্ষিত লোকদের শিক্ষার জন্য পুরাণকারেরা ঐরূপ অনেক কাল্পনিক উপাখ্যান রচনা করিয়াছেন। আবার ভাবিলেন, প্রহ্লাদচরিত্র যদি বা কাল্পনিকও হয়, তথাপি পুরাণকার যে ইহাতে ক্ষমাধর্ম্মের অতি উচ্চ আদর্শ অঙ্কিত করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমার প্রকৃতি কি ভীষণ! কি প্রতিহিংসাপরায়ণ! আমার মাথা যেমন একটু ঠিক হইয়াছে, অমনি আমি ভাবিতেছি, কেমন করিয়া তারককে তার বিশ্বাসঘাতকতার উপযুক্ত শাস্তি দিব, আর তারই সুযোগ খুঁজিয়া বেড়াইতেছি ; প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিতে পাইলেই কি শান্তি পাইব? সে কথা বলা শক্ত। তারকের কথা আর ভাবিব না, সে সুখে আছে সুখে থাকুক, আমি তার সুখের পথের কণ্টক হইব না। কিন্তু তাহা হইলে পাপের প্রশ্রয় দেওয়া হইবে। নাঃ, আজ আর ভাবিতে পারি না। এখন একটু ঘুমাইবার চেষ্টা করি।

তারপর দিন প্রাতঃকালে বরদাকান্তের ভয়ানক জ্বর হইল। তিনি সেদিন সন্ধ্যার পর কথকতা শুনিতে যাইতে পারিলেন না। পাঁচ দিন পর সুস্থ হইয়া অন্ন পথ্য করিলেন। সেই দিন বৈকালবেলায় সেই আখড়ায় কৃষ্ণদাস বাবাজীর গুরুদেব গৌরদাস বাবাজী আসিলেন। গৌরদাস বাবাজী বরদাকান্ত রাওকে দেখিয়া বলিলেন, "বাবা, তোমার মুখচোখ দেখিয়া মনে হইতেছে, তোমার মনে যেন শান্তি নাই। তোমার চক্ষুতে প্রতিহিংসার দীপ্তি দেখিতেছি। তোমার এখন বয়স হইয়াছে। এখন আর হিংসা দ্বেষ কেন বাবা? এখন ওসব চিন্তা ছাড়িয়া দিয়া গৌরাঙ্গ চরণে মনপ্রাণ সমর্পণ কর, সর্ব্বত্র সমবুদ্ধি হও। কাহারও উপর বিদ্বেষ রাখিও না। এইখানে থাকিয়া ঠাকুরের প্রসাদ পাও, আর দিনরাত হরিনাম কর।"

বরদাকান্ত। বাবাজী, সত্যই বলিয়াছেন, আমি বড়ই অশান্তিতে কাল কাটাইতেছি। আপনি আমার সকল কথা শুনিয়া, এখন আমার পক্ষে কি শ্রেয়ঃ তাহাই বলুন। আমি আর নিজের মনের সঙ্গে লড়িতে পারিতেছি না। আপনি মহাপুরুষ, আমাকে কৃপা করুন।

গৌরদাস বাবাজী। হরেকৃষ্ণ, আমি অতি অধম। আমাকে মহাপুরুষ বলিয়া অপরাধী করিবেন না। আপনার প্রতি মহাপ্রভুর কৃপা হইবে। আজ সন্ধ্যার পর আপনি আমাদের নামকীর্ত্তনে যোগ দিবেন। তার পর, রাত্রি এক প্রহরের সময়, আপনার কথা শুনিব।

তাহাই স্থির হইল। সেই দিন সন্ধ্যার পর গৌরদাস বাবাজী ও সেই আখড়ার কৃষ্ণদাস প্রভৃতি বাবাজীগণ হরিনাম কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। সেই পাড়ার আরও কয়েকজন তাহাতে যোগ দিল। বরদাকান্তও সে দলে রহিলেন। আর সকলেই থাকিয়া থাকিয়া হরিধ্বনি করেন, কিন্তু বরদাকান্ত কিছুতেই হরি বলিতে পারেন

না। হরিধ্বনি করিতে তাঁর কেমন লজ্জা বোধ হয়। তাঁর অনভ্যস্ত জিহ্বা কিছুতেই হরিনাম উচ্চারণ করিতে চাহে না। তবে অন্যান্য দিন হরিনাম সংকীর্ত্তন শুনিয়া তাঁর বিরক্তি বোধ হইত, আজ আর তা' হইল না।

রাত্রি এক প্রহরের পর গৌরদাস বাবাজী, বরদাকান্তের কক্ষে আসিলেন। বরদাকান্ত তাঁহার জীবনের সকল কথাই গৌরদাস বাবাজীকে বলিলেন। তারকের বিশ্বাসঘাতকতা ও অকৃতজ্ঞতার কথাও বলিলেন। সকল কথা শুনিয়া গৌরদাস বাবাজী বলিলেন, "আপনি তারক-সংক্রান্ত কথা আর কাহাকেও বলিবেন না। তাহা হইলে সে বেচারিকে লোক-সমাজে অপদস্থ করা হইবে। তার প্রয়োজন নাই। সে আপনার পুত্রতুল্য। আপনি তার অপরাধ ক্ষমা করুন। তাকে লোক-সমাজে অপদস্থ করিলে বা অনুরূপ শাস্তি দিলেই যে আপনি মনে শান্তি পাইবেন, তা ভাবিবেন না। শাস্তি দিবার কর্ত্তা ভগবান্। আমরা কে? ভগবানের যদি অনুগ্রহ হয়, তারকের সুমতি হইবে; তখন সে নিজেই আসিয়া আপনার ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া যাইবে। আপনি এ বয়সে আর অসার-সংসারের বিষয় ভাবিবেন না। যতদিন বাঁচেন, এইখানেই থাকুন, ঠাকুরের প্রসাদ পান, হরিনাম করুন। যদি মনে করেন, ইহাতে সময় কেমন করিয়া কাটিবে, তাহা হইলে লীলাগ্রন্থ পাঠ করুন। বরদাকান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "লীলাগ্রন্থ কি?"

গৌরদাস বাবাজী। রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত, বিষ্ণু-পুরাণ, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থ।

বরদাকান্ত। প্রথমে কোন্ গ্রন্থ পড়িতে বলেন?

গৌরদাস বাবাজী। আপনি ঐ সকল গ্রন্থের মধ্যে কোন গ্রন্থ পূর্ব্বে পড়িয়াছেন?

বরদাকান্ত। পাঠ্যাবস্থায় রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি কতক পড়িয়াছি; কিন্তু শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত কখনও পড়ি নাই।

গৌরদাস বাবাজী। তাহা হইলে আপনি প্রথমে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ করুন।

"গৌরাঙ্গের দু'টি পদ, যার ধন সম্পদ,
সে জানে ভকতি-রস-সার;
গৌরাঙ্গ-মধুর-লীলা, যার কর্ণে প্রবেশিলা,
হৃদয় নির্ম্মল ভেল তার।"

যদি গ্রন্থের কোন স্থান আপনি বুঝিতে না পারেন, কৃষ্ণদাস বাবাজীকে বলিবেন, তিনি আপনাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিবেন।

বরদাকান্ত। আপনাদের এ আখড়ার ব্যয় নির্ব্বাহ হয় কেমন করিয়া?

গৌরদাস বাবাজী। ভিক্ষা করিয়া।

বরদাকান্ত। কে ভিক্ষা করেন?

গৌরদাস বাবাজী। কেন, কৃষ্ণদাস বাবাজী, ও আর আর যে সকল বাবাজীরা এখানে থাকেন সকলেই ভিক্ষা করেন।

বরদাকান্ত। মুষ্টিভিক্ষায় এত বড় আখড়ার ব্যয়নির্ব্বাহ হয়?

গৌরদাস বাবাজী। মহাপ্রভু ত চালাইয়া লইতেছেন।

বরদাকান্ত। তাহা হইলে আমারও ত শুধু বসিয়া না থাকিয়া, ভিক্ষা করিয়া আখড়ায় কিছু দেওয়া কর্ত্তব্য?

"আপনার শরীরে কুলায় আপনি তা করিতে পারেন। নহিলে কোন প্রয়োজন নাই।" এই বলিয়া গৌরদাস বাবাজী বরদাকান্তকে একখানি শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত এবং সন্ধ্যার সময় হরিনাম জপিবার জন্য একগাছি হরিনামের মালা দিয়া শ্রীবৃন্দাবনে চলিয়া গেলেন।

বরদাকান্ত গৌরদাস বাবাজীর উপদেশ অনুসারে চলিয়া দুই মাসের মধ্যেই বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁর মনের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। কোন ব্যক্তির উপরই আর তাঁর বিদ্বেষ নাই। তারকের অপরাধ তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা করিয়াছেন। আরও

কয়েকমাস পরে গৌরদাস বাবাজী পুনরায় সেই আখড়ায় আসিলেন। তখন বরদাকান্ত তাঁহার নিকট দীক্ষিত হইতে চাহিলেন। গৌরদাস বাবাজী বরদাকান্ত রাওকে যথাবিধি শ্রীচৈতন্য-মন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন। বরদাকান্ত সেই আখড়ায় এক প্রকার স্থায়ী ভাবে রহিয়া গেলেন। পরম শান্তিতে তাঁর কাল কাটিতে লাগিল।

সেদিন তারক বরদাকান্তকে কৃষ্ণদাস বাবাজীর সহিত নয়ানচাঁদ দত্তের ষ্ট্রীটের মোড়ে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া ভয় পাইয়াছিলেন। বরদাকান্ত তারককে দেখিতে পান নাই।

২৯

সোমবার বেলা আটটার সময় তারক দক্ষিণপাড়ায় ফিরিলেন। এই দুই দিনে তাঁহার শরীর আধখানা হইয়া গিয়াছে। আত্রেয়ী তারককে সে কথা জিজ্ঞাসা করিলে তারক বলিলেন, "মন ভাল নাই। এত দিন আমার যে শত্রুটা মরিয়াছে জানিতাম, গতকল্য তাহাকে জীবিত দেখিয়াছি। সে আমাকে দেখিতে পাইয়াছে কিনা বলিতে পারি না। সেই হতভাগাটা আমার জীবনের সকল সুখ-শান্তি নষ্ট করিল দেখিতেছি।" আত্রেয়ী জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেই পাগল বুড়াটার কথা বলিতেছ নাকি?" তারক বলিলেন, "হাঁ। তার প্রকৃতি বড় ভীষণ। এ বাড়ী সে একদিন দেখিয়া গিয়াছে। কবে যে কি করিয়া বসে তার ঠিক নাই। এমন প্রাণ হাতে করিয়া থাকা মহা দায়।" আত্রেয়ী উদ্বিগ্ন হইয়া বলিলেন, "এক বছরের ছুটি লইয়া, কিছু দিন কোন দূরদেশে বাস করিলে হয় না? সেবার চেষ্টা করিয়াও ত ছুটি পাও নাই। এবার বোধ হয় পাইবে।"

তারক। তাই করিব। কিন্তু যেরূপ কাজের চাপ তাহাতে মাস দুয়ের মধ্যে ছুটির কথা মুখে আনিতে পারিব না। অথচ এখন প্রতিদিনই কলিকাতা যাওয়া দরকার।

আত্রেয়ী। আজ আবার যাইতে হইবে নাকি ?

তারক। আজ আর যাইব না। কাল যাইতেই হইবে।

আত্রেয়ী। কাল আমারও একবার সরলার সঙ্গে দেখা করিতে ইচ্ছা হইতেছে। তোমার যদি অসুবিধা না হয়, তাহা হইলে তোমার সঙ্গে যাই। সুবিধা হয় ত এক সঙ্গেই ফিরিব। না হয়, আমি আগেই ফিরিব। তুমি কাজ সারিয়া কখন হাবড়া ষ্টেশনে আসিতে পারিবে ?

তারক। একটু তাড়াতাড়ি করিলে সাড়ে চারটার সময়।

আত্রেয়ী। তাহা হইলে তাই করিও। পাঁচটার গাড়ীতে আমরা দুজনে এক সঙ্গেই ফিরিয়া আসিব। আমি হাবড়া ষ্টেশন হইতে বরাবর সরলাদের বাড়ী চলিয়া যাইব। তোমার যদি অসুবিধা না হয়, আমাকে সেখানে পৌছাইয়া দিয়া কলেজ যাইও।

তারক। আচ্ছা তাহাই করিব।

আত্রেয়ী। এখন কিছু দিন খুব সাবধানে চলাফিরা করিও। কলিকাতায় পারত পক্ষে হাঁটিয়া এখানে ওখানে কারও না।

তারক। তা আর বলিতে !

পর দিন বেলা দশটার সময় আহার করিয়া এগারটার ট্রেণে তারক ও আত্রেয়ী কলিকাতায় গেলেন। তারক আত্রেয়ীকে সরলাদের বাড়ীতে পৌছাইয়া দিয়া কলেজে গেলেন।

৩০

মাস দুই এক প্রকার নির্বিঘ্নে কাটিয়া গেল। একদিন কলেজের ঠিকানায় তারকের নিকট ছাপা অক্ষরে ঠিকানা লেখা একখানা খাম ডাকে আসিল। তারক বুঝিলেন, বিশেষ প্রয়োজন-বশতঃ সুধীরা তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছে। তিনি তখনই আত্রেয়ীকে একখানি চিঠি লিখিয়া জানাইলেন, "আমার যদি বাড়ী ফিরিতে দু'তিন দিন দেরী হয়, সেজন্য তুমি চিন্তিত

হইও না। বিশেষ প্রয়োজনবশতঃ আমার দু'চার দিনের জন্য কলিকাতার বাহিরে যাওয়ার প্রয়োজন হইতে পারে।" সেই দিন সন্ধ্যার ট্রেণে লিলুয়া ষ্টেশনে নামিয়া তাড়াতাড়ি নয়াবাজারের দিকে চলিলেন। সুখীয়ার অধিকৃত বাড়ীর দুয়ার ঠেলিবামাত্র টহলার মা দুয়ার খুলিয়া দিল। তারককে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সুখীয়া কাঁদিয়া উঠিল। ব্যাপার কি? সুখীয়ার ছোট ছেলেটির দুই দিন হইতে জ্বর হইয়াছে। জ্বরে বেচারী অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে। তারক সুখীয়াকে সাহস দিয়া বলিলেন, "কোন ভয় নাই, ওষুধ দিলেই সারিয়া যাইবে।" এই বলিয়া সুখীয়ার বাক্স হইতে অডিকলোন বাহির করিয়া জলে মিশাইয়া সেই জল খোকার মাথায় দিয়া বাতাস করিতে বলিয়া ডাক্তার আনিতে গেলেন। আধঘণ্টার মধ্যেই একজন এম্. বি ডাক্তার লইয়া ফিরিলেন। ইনি রেলের ডাক্তার। ডাক্তার রোগীর অবস্থা দেখিয়া মুখ বিকৃত করিলেন। বুক, পিঠ, জিভ্ অনেকক্ষণ ধরিয়া পরীক্ষা করিলেন, থার্ম্মোমিটার দ্বারা জ্বরের তাপ লইলেন, নাড়ীর গতি পরীক্ষা করিলেন। ডাক্তারী শাস্ত্রে যত প্রকার কসরৎ করিতে হয়, তাহার কিছুই বাকী রাখিলেন না। তার পর ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া শুশ্রূষা সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া ভিজিট লইয়া চলিয়া গেলেন। তারক প্রাণপণ চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। রাত্রি প্রায় বারটার সময় শিশুটির প্রাণপাখী দেহপিঞ্জর ছাড়িয়া উড়িয়া গেল। সুখীয়া মূর্চ্ছিত হইল। তারক সুখীয়াকে সুস্থ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

তার পর দিনও সুখীয়া উঠিতে চায় না। কেবলই কাঁদে। তার কান্না দেখিয়া হাবলাও কাঁদে। তারক অনেক বুঝাইলেন, সুখীয়া কিছুতেই বুঝে না।

এইরূপে তিন দিন কাটিয়া গেল। তারক সুখীয়ার কাছ

ছাড়িয়া কোথাও যাইতে পারিলেন না। কলেজের কর্তৃপক্ষকে চিঠি লিখিয়া সাত দিনের জন্য ছুটি লইলেন। এ বাড়ীতে সুখীয়াকে রাখা অসম্ভব হইল। তারক স্থির করিলেন, অতঃপর সুখীয়াকে খিদিরপুরে রাখিবেন। এ কথা তিনি ইতিপূর্ব্বেও ভাবিয়াছিলেন। কয়েকটা বাড়ীও তাঁর সন্ধানে ছিল।

সুখীয়াকে অনেক বুঝাইয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ফিরিবেন বলিয়া চতুর্থ দিবসে এগারটার ট্রেণে তারক হাবড়া গেলেন। হাবড়া হইতে বরাবর খিদিরপুরে গিয়া সদর রাস্তার ধারেই একটি ক্ষুদ্র দোতালা বাড়ী ভাড়া করিলেন। মাসিক ৩০৲ টাকা ভাড়া স্থির হইল। বাড়ীটি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আগামী কল্যই সে বাড়ীতে আসিবেন এরূপ বন্দোবস্ত করিয়া সন্ধ্যার সময় নয়াবাজারে ফিরিয়া সুখীয়াকে সে কথা জানাইলেন। শুনিয়া সুখীয়ার মন একটু ভাল হইল।

৩১

পাঁচ দিন তারক দক্ষিণপাড়ায় যাইতে পারেন নাই। আর কোন চিঠিও দেন নাই। সেজন্য আত্রেয়ী একটু চিন্তিত। ভাবিলেন, আজ এগারটার ট্রেণে কলিকাতা গিয়া প্রথমে সরলার সঙ্গে দেখা করিতে যাইবেন, সেখানে ঘণ্টাখানেক কাটাইয়া সুবিধা বোধ করিলে একবার নবীন মজুমদার মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁর কাছে স্বামীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিবেন।

আহারান্তে আত্রেয়ী এগারটার ট্রেণে হাবড়া যাত্রা করিলেন। ট্রেণ ঠিক বারটার সময় হাবড়া ষ্টেশনে পৌঁছিল। আত্রেয়ী টিকিট দিয়া ষ্টেশন হইতে বাহির হইয়া আসিতেছেন, এমন সময় "এই যে মাসী" এই কথা তাঁর কানে গেল। শব্দ অনুসারে দৃষ্টি ফিরাইয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তিনি দেখিলেন যে, অনতিদূরে তারক দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁর পশ্চাতেই হাবলাকে কোলে করিয়া সুখীয়া।

হাব্‌লাই আত্রেয়ীকে দেখিয়া "ঐ যে মাসী" বলিয়া চীৎকার করিয়াছিল। আত্রেয়ী যে এখন কি করিবেন তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে কর্ত্তব্য স্থির করিয়া যেন তারককে দেখিতেই পান নাই এইরূপ ভাব দেখাইয়া সুখীয়ার কাছে গিয়া সহজ কণ্ঠে বলিলেন, "একি সুখীয়া যে, ভাল আছ ত?"

সুখীয়া আত্রেয়ীকে দেখিয়া আকুল কণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিল। আত্রেয়ী ব্যাকুল হইয়া বলিলেন, "একি, কাঁদিতেছ কেন?" সুখীয়া কাঁদিবার কারণ বলিল। শুনিয়া আত্রেয়ী অশ্রুসংবরণ করিতে পারিলেন না। ব্যাপার দেখিয়া হাব্‌লাও কাঁদিতে সুরু করিল। আত্রেয়ী হাব্‌লাকে কোলে করিয়া তার চোখের জল মুছাইয়া দিয়া ফেরিওয়ালার কাছ হইতে কয়েকটা খেলনা ও গোটা কয়েক লেবেনচুস কিনিয়া হাব্‌লার হাতে দিলেন; অমনি হাব্‌লার মুখে হাসি দেখা দিল। আত্রেয়ী সুখীয়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে কার সঙ্গে আসিয়াছ?" সুখীয়া বলিল, "আর কার সঙ্গে? আমাকে উনি সঙ্গে ক'রে এনেছেন। ওখানে আর থাক্‌তে পার্‌লাম না, তাই খিদিরপুরে একটা বাড়ী ঠিক করা হ'য়েছে, আমরা সেইখানেই যাচ্ছি। উনি কোথায় গেলেন?" হাব্‌লা হাত দিয়া দেখাইয়া দিয়া বলিল, "ঐ দেখ বাবা।" আত্রেয়ী ও সুখীয়া উভয়ে চাহিয়া দেখিলেন, তারক একটু দূরে একটা ঘোড়গাড়ীর আড়ালে মুখ নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। তারক তখন আত্রেয়ীকে যে কি বলিবেন তা মনে মনে ঠিক করিতেছিলেন। আত্রেয়ী সুখীয়াকে বলিলেন, "তুমি এইখানে দাঁড়াইয়া থাক, আমি শীঘ্রই ফিরিয়া আসিতেছি।" এই বলিয়া তারকের দিকে অগ্রসর হইলেন। তারক আত্রেয়ীকে দেখিয়া ফাঁপরে পড়িলেন। সে স্থানে থাকিবেন, কি সে স্থান হইতে সরিয়া পড়িবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। ইতিমধ্যে আত্রেয়ী দ্রুতপদবিক্ষেপে তারকের কাছে গিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "আমি সব জানিতে

পারিয়াছি, এখন সুখীয়াকে কিছু জানাইয়া দরকার নাই। আমিও তোমাদের সঙ্গে খিদিরপুরে যাই চল। আহা, সুখীয়া বেচারী মনে বড়ই কষ্ট পাইয়াছে।" আত্রেয়ীর মুখে এই কথা শুনিয়া তারক যেন আকাশ হইতে পড়িলেন। আত্রেয়ীর নিকট এরূপ ব্যবহার তিনি কখনই প্রত্যাশা করেন নাই। তিনি কিছুক্ষণ কোন কথাই বলিতে পারিলেন না। আত্রেয়ী বলিলেন, "এখানে অনর্থক দেরী করিলে কি হইবে?" তারক কোনও রকমে বলিলেন, "তুমি সুখীয়ার কাছে যাও, আমি শীঘ্রই আসিতেছি।" কিন্তু মুখ তুলিয়া আত্রেয়ীর দিকে চাহিতে পারিলেন না। আত্রেয়ী সুখীয়ার কাছে ফিরিয়া গেলেন। ইতিমধ্যে তারক লগেজ করা কয়েকটি জিনিস লগেজের কেরাণীর কবল হইতে মুক্ত করিয়া একটি গাড়ী বোঝাই করাইলেন এবং আর একখানি গাড়ীর ভিতর আত্রেয়ী, সুখীয়া ও হাবলাকে উঠাইয়া দিয়া নিজে জিনিসপত্র বোঝাই গাড়ীতে উঠিবার জন্য যাইতেছেন দেখিয়া আত্রেয়ী বলিলেন, "আমি আর সুখীয়া এক বেঞ্চে বসিতেছি, আপনি হাবলাকে কোলে করিয়া অপর বেঞ্চে বসুন। জিনিসপত্র বোঝাই গাড়ীতে উঠিলে আপনার অসুবিধা হইবে।" তারক ফিরিলেন, আত্রেয়ীদের গাড়ীতে উঠিবার জন্য পা বাড়াইয়াছেন, এমন সময়ে সভয়ে দেখিলেন, অনতিদূরে বরদাকান্ত রাও, তিনি তারকের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। দেখিয়া ভয়ে তারকের আত্মাপুরুষ শুকাইয়া গেল, কোন রকমে গাড়ীর দরজা বন্ধ করিয়া গাড়োয়ানকে বলিলেন, "জোরসে হাঁকাও।" গাড়োয়ান সপাং সপাং করিয়া ঘোড়ার পিঠে চাবুক কসিল। দ্রুতবেগে গাড়ী চলিল।

বরদাকান্ত তারককে দেখিয়াছিলেন।

ইহার দুই দিন পরে তারক বরদাকান্ত রায়ের লেখা একখানি চিঠি পাইলেন। তাহাতে বরদাকান্ত লিখিয়াছেন, "তুমি আমাকে

সে দিন হাবড়া ষ্টেশনে দেখিয়া ভয় পাইয়াছিলে। তোমার প্রতি এখন আমার আর বিদ্বেষ নাই। এমন দিন ছিল, যখন আমি মনে করিতাম যে কোন উপায়েই হউক না কেন তোমার অনিষ্ট করিব। ভগবানের কৃপায় এখন আমার মনের গতিক বদলাইয়াছে। আমা হইতে তোমার কোন আশঙ্কার কারণ নাই। গুরুদেবের আশীর্ব্বাদে আমি এখন শান্তিলাভ করিয়াছি। তিন চার দিনের মধ্যেই আমি শ্রীবৃন্দাবনধামে যাইব, তুমি ইচ্ছা করিলে উপরি উক্ত ঠিকানায় আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পার। তোমার সহিত আমার যে কি সম্বন্ধ তাহা অন্য কেহ জানিতে পারিবে না।” এই চিঠি পাইয়া তারক মহা ভাবনায় পড়িলেন। একবার ভাবিলেন, চিঠিখানি তাঁহাকে ফাঁদে ফেলিবার কৌশল,—আবার ভাবিলেন, ‘তা নাও হইতে পারে। বরদাকান্ত রাওয়ের সহিত দেখা করিতে যাইবেন কিনা, তাঁর চিঠির কথা আত্রেয়ীকে জানাইয়া তাঁর পরামর্শ লইবেন কি না, আত্রেয়ীকে বরদাকান্ত সম্বন্ধে নূতন কথা বলিলে তিনি কি মনে করিবেন? তারক যে কত বড় বিশ্বাসঘাতক ও অকৃতজ্ঞ তা জানিতে পারিবেন। তাহা তাঁকে জানিতে দেওয়া উচিত কি না? আত্রেয়ী তারকের সহিত যেরূপ সদ্ব্যবহার করিতেছেন, তাহাতে আত্রেয়ীর কাছে সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলাই কর্ত্তব্য। লুকোচুরিতে তারকের বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে! লাভ লোকসান খতাইয়া দেখিলে তাহাতে যে পরিণামে বড় একটা লাভ আছে তাও মনে হয় না। এইরূপ ভাবিয়া তারক অবশেষে বরদাকান্ত রাও সম্বন্ধে সকল কথাই আত্রেয়ীকে জানাইলেন।

আত্রেয়ী তাহা শুনিয়া বলিলেন, “অবিলম্বে তাঁর কাছে গিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য এবং তাঁহাকে আমাদের কাছে রাখিয়া তাঁহার সেবাশুশ্রূষা করিয়া আমাদের পূর্ব্বকৃত পাপের কথঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত।” তারক বলিলেন, “লোকের কাছে মুখ

দেখাইব কেমন করিয়া ? তাহা হইলে আমার কলিকাতায় থাকা চলে না।"

আত্রেয়ী। যদি আবশ্যক বোধ কর কলিকাতা ছাড়িয়া যাইতে হইবে।

তারক। কলিকাতা ছাড়িয়া কোথায় যাইব ? সেখানে কেমন করিয়া চলিবে ?

আত্রেয়ী। কাশীতে গিয়া থাকিলে তোমার চলিবার ভাবনা হইবে না। সামান্য চেষ্টায় তুমি সেখানকার কলেজে অধ্যাপকের কাজ জুটাইতে পারিবে। সে যাহা হয় পরে ঠিক করা যাইবে। আজই তুমি তাঁকে একখানি চিঠি লিখিয়া দাও যে, আগামী কল্য বৈকালবেলায় আমরা তাঁহাকে প্রণাম করিতে যাইব।

তারক আত্রেয়ীর কথা ঠেলিতে পারিলেন না। চিঠি লিখিয়া ডাকে দিলেন।

পর দিবস বৈকালবেলায় উভয়ে বরদাকান্ত রাওয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য কলিকাতার মধু রায়ের গলিস্থিত সেই আখড়ায় উপস্থিত হইলেন। বরদাকান্ত একটি নির্জ্জন কক্ষে তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তারক বরদাকান্তের পা জড়াইয়া ধরিয়া অশ্রুপূর্ণ-নয়নে তাঁর নিকট পূর্ব্বাপরাধের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন।

বরদাকান্ত তারককে বুকে টানিয়া লইয়া কিয়ৎক্ষণ নীরব রহিলেন। আত্রেয়ী বরদাকান্তকে প্রণাম করিয়া তাঁর পায়ের ধূলা লইলেন।

বরদাকান্ত বলিলেন, "আমি তোমাকে পূর্ব্বেই ক্ষমা করিয়াছি। বৌমার সঙ্গে তোমাকে এখানে আসিতে দেখিয়া বড়ই সুখী হইলাম। আমি শীঘ্রই শ্রীবৃন্দাবনধাম যাইব।"

আত্রেয়ী। এখন কিছুদিন আপনার সেখানে যাওয়া হইবে না। আপনি কয়েক বৎসর বড় কষ্ট পাইয়াছেন। কিছুদিন

আমাদের কাছে থাকিয়া আমাদিগকে আপনার সেবা করিয়া কৃতার্থ হইতে দিন।

বরদাকান্ত। না মা, আর আমাকে অসার সংসারের মায়ার ডোরে বাঁধিতে চাহিও না। যাইবার পূর্ব্বে তোমার সঙ্গে দেখা হইল, ভালই হইল।

আত্রেয়ী। যদি নিতান্তই না থাকেন, তাহা হইলে এক দিনের জন্যও অন্ততঃ খিদিরপুরের বাড়ীতে পায়ের ধূলা দিতে হইবে। সেখানে আপনার আর এক কন্যা, আর আপনার এক নাতি আছে, তাহাদের আশীর্ব্বাদ করিয়া আসিবেন। আর আপনি যদি বলেন তারাই এখানে আসিয়া আপনাকে প্রণাম করিয়া যাইবে।

বরদাকান্ত। মানুষ বড় লোভী। তোমার কথা শুনিয়া আমার সংসারে থাকিতে ইচ্ছা হইতেছে। কিন্তু আর না। তোমাদের যদি একান্তই ইচ্ছা হইয়া থাকে, তাহা হইলে তোমরা আজ যাও, আগামী কল্য বেলা আটটার সময় আমি তোমাদের খিদিরপুরের বাসায় যাইব। সন্ধ্যার পূর্ব্বে সেখান হইতে ফিরিয়া রাত্রের ট্রেণে শ্রীবৃন্দাবন রওনা হইব। আশীর্ব্বাদ করি, তোমাদের ধর্ম্মে মতি হউক।

তারক ও আত্রেয়ী বরদাকান্তকে প্রণাম করিয়া খিদিরপুরে ফিরিয়া আসিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে তারক গিয়া বরদাকান্তকে খিদিরপুরের বাসায় লইয়া আসিলেন। বরদাকান্ত সেখানে সারাদিন কাটাইয়া রাত্রি আটটার সময় সকলকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় হইলেন। তারক তাঁহাকে ট্রেণে তুলিয়া দিবার জন্য হাবড়া পর্য্যন্ত সঙ্গে গেলেন।

রাত্রি দশটায় ট্রেণ। তারক টিকিট কিনিয়া বরদাকান্তকে ট্রেণে তুলিয়া দিয়া প্রণাম করিয়া তাঁর পায়ের ধূলা মাথায় লইলেন। ট্রেণ ছাড়িয়া দিল। তারক শূন্যমনে খিদিরপুরে ফিরিয়া আসিলেন।

আট-আনা-সংস্করণ-গ্রন্থমালা

মূল্যবান্ সংস্করণের মতই—

কাগজ, ছাপা, বাঁধাই,—সর্ব্বাঙ্গসুন্দর।

—আধুনিক শ্রেষ্ঠ লেখকের পুস্তকই প্রকাশিত হয়।—

বঙ্গদেশে যাহা কেহ ভাবেন নাই, শুনেন নাই, আশাও করেন নাই। আমরাই ইহার প্রথম প্রবর্ত্তক। বিলাতকেও হার মানিতে হইয়াছে—সমগ্র ভারতবর্ষে ইহা নূতন সৃষ্টি! বঙ্গসাহিত্যের অধিক প্রচারের আশায় ও যাহাতে সকল শ্রেণীর ব্যক্তিই উৎকৃষ্ট পুস্তক-পাঠে সমর্থ হন, সেই মহা উদ্দেশ্যে আমরা এই অভিনব 'আট-আনা-সংস্করণ' প্রকাশ করিয়াছি।

প্রতি বাঙ্গালা মাসে একখানি নূতন পুস্তক প্রকাশিত হয়:—

মফস্বলবাসীদের সুবিধার্থ, নাম রেজেষ্ট্রি করা হয়; গ্রাহকদিগের নিকট নব-প্রকাশিত পুস্তক ভিঃ পিঃ ডাকে প্রেরিত হয়। প্রকাশিতগুলি একত্র বা পত্র লিখিয়া সুবিধানুযায়ী পৃথক্ পৃথক্ও লইতে পারেন।

ডাকবিভাগের নূতন নিয়মানুসারে মাশুলের হার বর্দ্ধিত হওয়ায়, গ্রাহক-দিগের প্রতি পুস্তক ভিঃ পিঃ ডাকে ৵০ লাগিবে। অ-গ্রাহকদিগের ৵/০ লাগিবে।

গ্রাহকদিগের কোন বিষয় জানিতে হইলে, **"গ্রাহক-নম্বর"** সহ পত্র দিতে হইবে।

এই গ্রন্থমালায় প্রকাশিত হইয়াছে—

১। **অভাগী** (৫ম সংস্করণ)—শ্রীজলধর সেন।
২। **ধর্ম্মপাল** (২য় সংস্করণ)—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ।

৩। **পল্লীসমাজ** (৭ম সংস্করণ)—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
৪। **কাঞ্চনমালা** (২য় সং)—মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম, এ।
৫। **বিবাহবিপ্লব** (২য় সংস্করণ)—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত এম, এ, বি, এল্।
৬। **চিত্রালী** (২য় সংস্করণ)—শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৭। **দুর্ব্বাদল** (২য় সংস্করণ)—শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত।
৮। **শাশ্বত-ভিখারী** (২য় সং)—শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায় এম, এ।
৯। **বড়বাড়ী** (৩য় সংস্করণ)—শ্রীজলধর সেন।
১০। **অরক্ষণীয়া** (৫ম সংস্করণ)—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
১১। **ময়ূখ** (২য় সংস্করণ)—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ।
১২। **সত্য ও মিথ্যা** (২য় সংস্করণ)—শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।
১৩। **রূপের বালাই**—শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়। (২য় সং—যন্ত্রস্থ)
১৪। **সোণার পদ্ম** (২য় সং)—শ্রীসরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ।
১৫। **লাইকা** (২য় সংস্করণ)—শ্রীমতী হেমনলিনী দেবী।
১৬। **আলেয়া** (২য় সংস্করণ)—শ্রীমতী নিরুপমা দেবী।
১৭। **বেগম সমরু** (সচিত্র)—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
১৮। **নকল পাঞ্জাবী** (২য় সংস্করণ)—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত।
১৯। **বিল্বদল**—শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত। (২য় সং—যন্ত্রস্থ)
২০। **হাল্‌দার বাড়ী**—শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী। (২য় সং—যন্ত্রস্থ)
২১। **মধুপর্ক**—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।
২২। **লীলার স্বপ্ন**—শ্রীমনোমোহন রায়, বি-এল।
২৩। **সুখের ঘর** (২য় সংস্করণ)—শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত এম, এ।
২৪। **মধুমল্লী**—শ্রীমতী অনুরূপা দেবী। (২য় সং—যন্ত্রস্থ)
২৫। **রানির ডায়েরী**—শ্রীমতী কাঞ্চনমালা দেবী।
২৬। **ফুলের তোড়া**—শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী। (২য় সং—যন্ত্রস্থ)
২৭। **ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস**—শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষ।

২৮। **সীমন্তিনী**—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু।

। **নব্য-বিজ্ঞান**—অধ্যাপক শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, এ।

৩০। **নববর্ষের স্বপ্ন**—শ্রীসরলা দেবী।

৩১। **নীলমাণিক**—রায় সাহেব শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন বি, এ।

৩২। **হিসাব নিকাশ**—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত এম, এ, বি, এল্।

৩৩। **মায়ের প্রসাদ**—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ।

৩৪। **ইংরাজী কাব্যকথা**—শ্রীআশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম, এ।

৩৫। **ফুলছবি**—শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

৩৬। **সন্তানের দান**—শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

৩৭। **ব্রাহ্মণ-পরিবার**—শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য। (২য় সং—যন্ত্রস্থ)

৩৮। **পথে-বিপথে**—শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সি, আই, ই।

৩৯। **হরিশ ভাণ্ডারী** (২য় সংস্করণ)—শ্রীজলধর সেন।

৪০। **কোন্ পথে**—শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত এম, এ।

৪১। **পরিণাম**—শ্রীগুরুদাস সরকার এম, এ।

৪২। **পল্লীরাণী**—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

৪৩। **ভবানী**—৺নিত্যকৃষ্ণ বসু।

৪৪। **অমিয় উৎস**—শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়।

৪৫। **অপরিচিতা**—শ্রীপান্নালাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ।

৪৬। **প্রত্যাবর্ত্তন**—শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

৪৭। **দ্বিতীয় পক্ষ**—ডাঃ শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম-এ, ডি-এল।

৪৮। **ছবি** (২য় সংস্করণ)—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

৪৯। **মনোরমা**—শ্রীসরসীবালা বসু।

৫০। **সুরেশের শিক্ষা**—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম, এ।

৫১। **নাচওয়ালী**—শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ এম, এ।

৫২। **প্রেমের কথা**—শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম, এ।

৫৩। **গৃহহারা**—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
৫৪। **দেওয়ানজী**—শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।
৫৫। **কাঙ্গালের ঠাকুর**—শ্রীজলধর সেন।
৫৬। **গৃহদেবী**—শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার।
৫৭। **হৈমবতী**—শ্রীচন্দ্রশেখর কর।
৫৮। **বোঝা পড়া**—শ্রীনরেন্দ্র দেব।
৫৯। **বৈজ্ঞানিকের বিকৃত বুদ্ধি**—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়।
৬০। **হারান ধন**—শ্রীনসীরাম দেবশর্ম্মা।
৬১। **গৃহ-কল্যাণী**—শ্রীপ্রফুল্লকুমার মণ্ডল।
৬২। **ঘরের হাওয়া**—শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বসু বি, এস্-সি।
৬৩। **প্রতিভা**—বরদাকান্ত সেন গুপ্ত।
৬৪। **আত্রেয়ী**—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রশশী গুপ্ত বি-এল।
৬৫। **লেডী ডাক্তার**—শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত, এম-এ (যন্ত্রস্থ)

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স—
২০১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা.